দশম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা
শ্রাবণ-আশ্বিন তেরশ সত্তর

কবিতা সংগীত শিল্পচর্চা ও
সমালোচনার ত্রৈমাসিক মুখপত্র

সম্পাদক
অরুণ ভট্টাচার্য

# উত্তরসূরী

ঋতুরঙ্গ : বর্ষা

শুধু রবীন্দ্রনাথ বা বৈষ্ণব পদাবলীতে নয়, সমগ্র কালিদাসেই বর্ষা সকল ঋতুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও অনন্য স্থান লাভ করেছে। প্রাচীন ভারতীয় সংগীতেও একাধিক রাগ রাগিণী বর্ষাকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে—মল্লার বা মল্লারিকাই যার শ্রেষ্ঠ রূপায়ণ। নায়িকা-কল্পনায় মল্লারিকার এমত বর্ণনা পাওয়া যায়: তিনি যুবতী, রূপলাবণ্যময়ী গৌরী কৃশা কোকিলকণ্ঠী গীতোচ্ছলা। ঘনঘোর বর্ষার নিশীথে প্রিয়তমের বিচ্ছেদে ব্যাকুল হয়ে তার মন চঞ্চল, তিনি ক্রন্দনরতা। সমধর্মী হলেও মেঘ রাগের বর্ণনা ভিন্নতর। যুবাশ্রেষ্ঠ পুরুষ তিনি, নিবিড় জটাজুটধারী মস্তকে উষ্ণীষ পরিহিত, ঘোরকৃষ্ণ বর্ণ, উন্নত দীর্ঘদেহী মেঘ রাগের মূল আবেদন বীর রসে। মেঘ ও মল্লারিকার বর্ণনায় পুরুষ ও নারী কল্পনাতে সৃষ্টির এক অভিন্ন পূর্ণ রূপায়ণ। প্রাচীন ভারতীয় সংগীতে এভাবেই প্রকৃতিকে রূপ চিত্র ও অনুপম কল্পনায় ধরে রাখবার চেষ্টা হয়েছে।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Uttarpara Jaikrishna Public Library

**বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী**

লেখক—**অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর**। 'বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী' শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের অমূল্য অবদান এবং বিশ্বসাহিত্যে অদ্বিতীয় নিদর্শনস্বরূপ। শিল্পকলা সংক্রান্ত যাবতীয় সংজ্ঞা, তত্ত্ব কথার মধ্যেও রয়েছে অপরূপ কথাচিত্র। **দাম : বার টাকা**

**নৈরাজ্যবাদ**

লেখক—**ডঃ অতীন্দ্রনাথ বসু**। নৈরাজ্যবাদের কল্পনা বহু প্রাচীন। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে চৈনিক দার্শনিক লাওৎসে থেকে শুরু করে গান্ধী পর্যন্ত অনেকেই নিরাজ সমাজের কল্পনা করেছেন। বিপ্লবী নৈরাজ্যবাদের চেয়ে আত্মিক নৈরাজ্যবাদের (Spiritual Anarchism) শ্রেষ্ঠতাই তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন। **দাম : দশ টাকা**

**ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন**

লেখক **সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর**। ধর্ম, সমাজ এবং দেশের অর্থনৈতিক সংস্কারে প্রেসের স্বাধীনতা রক্ষায় ও বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা পদ্ধতির প্রচলন প্রভৃতি ব্যাপারে রামমোহনের সর্বতোমুখী বুদ্ধি এবং দূরদৃষ্টি দেশের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনে অক্লান্তভাবে সচেষ্ট ছিল। ভারতের শিল্প বিপ্লবের পুরোধা হিসেবে ভারত পথিক রামমোহনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাই অনস্বীকার্য। **দাম : ছয় টাকা**

**জীবন-জিজ্ঞাসা**

লেখক—**আইনস্টাইন**। অনুবাদক—**শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়**। ভূমিকা—**সত্যেন্দ্রনাথ বসু**। মানুষ আইনস্টাইন পরিচায়ক এই গ্রন্থে তাঁর সাধারণ অভিমত ছাড়াও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থশাস্ত্র, রাষ্ট্র এবং শান্তিবাদ ইত্যাদি সম্বন্ধে আইনস্টাইনের রচনাবলীর পূর্ণাঙ্গ সংকলন করা হয়েছে। **দাম : আট টাকা**

**বাঙালী**

লেখক—**প্রবোধচন্দ্র ঘোষ**। বাঙালীর ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ, বৈশিষ্ট্য ও সমস্যা, সমাজ ও সংস্কৃতি প্রত্যেক ভারতীয়ের কাছেই অনুশীলনের বস্তু। সারা ভারতের পটভূমিতে সেই বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। **দাম : ছয় টাকা**

**ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ**

**বিভিন্ন ফরাসী বুদ্ধিজীবি লিখিত** এবং **পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়** কর্তৃক অনূদিত। স্যাঁ-জন পার্স, আঁদ্রে মোরোয়া থেকে শুরু করে হাল আমলের অগণ্য ফরাসী গুণীর চোখে রবীন্দ্রনাথের যে রূপ ধরা পড়েছে, তারই সংকলন। **দাম : পাঁচ টাকা**

**আমাদের ঘরের আশেপাশে**

লেখক—**ডঃ তারকমোহন দাস**, ভূমিকা—**সত্যেন্দ্রনাথ বসু**। দেশের ফুল ফল, গাছপালার ওপর এক স্বাভাবিক আত্মীয়তা বোধ মানুষের রক্তে মিশে আছে।—কি তাদের নাম? কি তাদের জীবন-বৈশিষ্ট্য? সে কাহিনীই এখানে পরিবেশিত। **দাম : পাঁচ টাকা**

**রূপা এণ্ড কোম্পানী**

১৫, বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

# বাংলা কবিতা

চতুর্থ পর্যায় : পশ্চিম অলিন্দ

শান্তি লাহিড়ী সম্পাদিত

আলোচ্য গ্রন্থে ছিয়াত্তরজন কবির মোট
একশো পঞ্চাশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে
অন্তর্ভুক্ত কবিদের মধ্যে রয়েছেন

অরবিন্দ গুহ সিদ্ধেশ্বর সেন শান্তিকুমার ঘোষ অসিতকুমার ভট্টাচার্য
দিলীপকুমার সেন সুশীলকুমার গুপ্ত দীপঙ্কর দাশগুপ্ত সুনীল বসু
সুনীলকুমার নন্দী মনোরঞ্জন রায় রবীন্দ্র বিশ্বাস শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়
সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য সমীর রায়চৌধুরী শঙ্খ ঘোষ
পূর্ণেন্দু পত্রী আলোক সরকার শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় তরুণ সান্যাল
প্রফুল্লকুমার দত্ত প্রকৃতি ভট্টাচার্য অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় কবিতা সিংহ
যুগান্তর চক্রবর্তী রমেন্দ্রনাথ মল্লিক সুগত বড়ুয়া অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
শক্তি চট্টোপাধ্যায় আনন্দ বাগচী স্নেহাকর ভট্টাচার্য শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়
ফণিভূষণ আচার্য স্বদেশরঞ্জন দত্ত কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত নিখিলকুমার নন্দী
চিত্ত সিংহ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শিবশম্ভু পাল দীপক মজুমদার শোভন সোম
সুরজিৎ দাশগুপ্ত মোহিত চট্টোপাধ্যায় বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত মানস রায় চৌধুরী
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত তুষার চট্টোপাধ্যায় সুধেন্দু মল্লিক তারাপদ রায় সামসুল হক
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় উৎপলকুমার বসু শিশিরকুমার দাশ প্রণবেন্দু
দাশগুপ্ত মঞ্জুলিকা দাশ মণিভূষণ ভট্টাচার্য পরিমল চক্রবর্তী শক্তিব্রত ঘোষ
জ্যোতির্ময় দত্ত শান্তি লাহিড়ী মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত পবিত্র সরকার
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দেবতোষ বসু প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় নচিকেতা
ভরদ্বাজ অনিরুদ্ধ কর রত্নেশ্বর হাজরা আশিস সান্যাল পলাশ মিত্র
সুশান্ত বসু কমলেশ চক্রবর্তী দিব্যেন্দু পালিত তন্ময় দত্ত
কেতকী কুশারী পবিত্র মুখোপাধ্যায়

মূল্য চার টাকা

সাহিত্য

অলংকরণ
মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

১ ডেকার্স লেন কলকাতা ১

**সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত**
**পৌরাণিক অভিধান**
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল
দাম দশ টাকা।

*** ভ্রমণ-কাহিনী ***

অন্নদাশঙ্কর রায়ের
**জাপানে** ৭·০০
॥ ১৯৬২ সালের জন্য সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার-প্রাপ্ত গ্রন্থ॥
**পথে প্রবাসে** ৪·০০
বুদ্ধদেব বসুর
**জাপানী জর্নাল** ৩·৫০
॥ লেখকের জাপান-ভ্রমণের সচিত্র দিনপঞ্জী॥
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের উপন্যাস
**মেঘের উপর প্রাসাদ** ৭·০০

*** কাব্য-গ্রন্থ ***

নরেন্দ্র দেব ও রাধারাণী দেবী সম্পাদিত
**কাব্য-দীপালী** ৭·০০
শ্রেষ্ঠ বাংলা কবিতার সর্বোত্তম সংকলন
সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের
**কাব্য-সঞ্চয়ন** ৬·০০
॥ কবির শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন। সর্বশেষ সংস্করণে কয়েকটি নূতন কবিতা সংযোজিত॥

**রাজশেখর বসুর**
**কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত**
চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হল
দাম সাড়ে বারো টাকা।
বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত
**কালিদাসের মেঘদূত** ৬·৫০
॥ মহাকবির অমর গ্রন্থের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা ॥

*** রবীন্দ্র-সাহিত্য ***

বিশু মুখোপাধ্যায়-সংকলিত
**রবীন্দ্র-সাগর-সঙ্গমে** ১০·০০
॥ বিশ্বকবির বিভিন্ন রচনার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমালোচনা ও টীকা-টিপ্পনী ॥
বুদ্ধদেব বসুর
**সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা : রবীন্দ্রনাথ** ৫·০০
॥ লেখকের সতেরোটি প্রবন্ধের সর্বাধুনিক সংকলন ॥
অমল হোম-প্রণীত
**পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ** ৩·৫০
শুভ গুহঠাকুরতার
**রবীন্দ্র-সঙ্গীতের ধারা** ৬·০০

**এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড,**
**১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২**

---

আশিস সান্যালের দ্বিতীয় কবিতাগ্রন্থ

**মৃত্যুদিন-জন্মদিন**

সমকালীন কাব্যজগতে আশিস সান্যাল একটি পরিচিত নাম। তরুণতর কবিদের মধ্যে তিনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বিভিন্ন বর্ণের উচ্চারণে তিনি গড়ে তুলেছেন তাঁর স্বরচিত জগৎ। সেখানে হরিণের নির্ভর পদচারনা খয়েরী জলের বিহ্বল শব্দ আর নিরভ্র রূপের অবিস্মরণীয় দীপ্তি। প্রেম, ইতিহাস ও যন্ত্রণার মৌলিক আতিথ্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার সমস্ত মুহূর্ত। কবিতাকে স্বাভাবিক করে তোলার তিনি পক্ষপাতী।

**সম্প্রতি প্রকাশনী**　　　　　　　　　　　　**দাম : দু**টাকা
**ইণ্ডিয়ানা** কলিকাতা ১২

---

## POLITICS, POWER AND PARTIES

**M. N. ROY**

A posthumous and latest publication of M. N. Roy's speeches and essays, selected and edited by his wife Ellen Roy. A critique of contemporary political systems and the bold outlines of a theory of grass-root democracy; an indispensible handbook for the social reformers and political workers, serious thinkers and intellectuals.

"The reader will find in these trenchant examples of Roy's political thinking the material on which he can found his own conclusions and to which he can apply his own tests....the appraisal of Roy's ideas for their attainment will depend on one's reading of history and the temperature of one's hopes. In any case, communication with this vivid and honest personality is a privilege."—*The Plain View,* Vol. XIII, No. 2, November, 1960.

RENAISSANCE PUBLISHERS (P) LIMITED
15, Bankim Chatterjee Street, Calcutta-12

আধুনিক কাব্য পরিচিতি

অরুণ ভট্টাচার্য-এর
**মিলিত সংসার**

সম্পর্কে সমালোচকের অভিমত: "তিরিশের কবিদের সর্বপ্লাবী কবিতার স্রোতে যে কলরব উঠেছে, তার ধ্বনিবিহ্বল ভবিষ্যৎ চল্লিশ ও পঞ্চাশের কবিদের সৎ-প্রতিভার দৃষ্টি গ্রাহ্যতায় যথেষ্ট বাধা সৃষ্টি করেছে। এখন কবিতা পাঠককে স্মরণ করিতে বলি, স্থির হতে বলি; এবং অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতার দর্পণে একবার নিজেদের প্রতিবিম্বিত হ'তে অনুরোধ করি। আপাত-সারল্যে কখনো কখনো 'মহৎ' আত্মগোপন করে, যেমন করেছিলো উইলিয়ম ব্লেকের কবিতায়। অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতায় নিষ্পাপ পবিত্রতা ও যন্ত্রণার অনুচ্চ অভিব্যক্তি ও ছন্দের কৌশল আমাদের যুগপৎ মুগ্ধ ও বিহ্বল করে। তাঁর আর একটি বিশেষ গুণ শব্দকে তিনি শব্দাতীত গভীর ব্যঞ্জনায় উত্তীর্ণ করতে পারেন।

এবং সাম্প্রতিক কবিতায় যা দারুণ দুর্লক্ষণ, অরুণ ভট্টাচার্যের কবিতায় সেই আরোপিত আর্তনাদ নেই, নেই অগ্রজ কবিদের ব্যর্থ অনুসৃতি"—'দেশ'॥

অরুণকুমার সরকার
**দূরের আকাশ**

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অরুণকুমার সরকার বর্তমান বাংলা কবিতায় দুজন প্রতিনিধিস্থানীয় কবি। আধুনিক কবিতার যা সদ্‌গুণ তা উভয়ের কাব্যেই প্রচুর পরিমানে বিদ্যমান।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
**জাতক ॥ লখিন্দর**

এবং আশার কথা, এ'দের কাব্যে মানবতাবাদী ঐতিহ্যের গভীর সূত্র অনুসন্ধান করলে ব্যর্থ হতে হয় না। জীবন-যন্ত্রণার সঙ্গে সুস্থ দার্শনিক মনোভঙ্গির আশ্চর্য মিলনেই এ'দের কবিতার সার্থকতা।

সিগনেট ও অন্যান্য পুস্তকালয়ে পাওয়া যাবে।
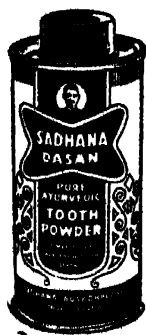
টাটার শ্যাম্পু আপনার চুলের গোছা পরিষ্কার সাফ করে দেয়!

সাবান দিয়ে-তৈরী শ্যাম্পুতে তা হয় না…

কেন?

টাটার শ্যাম্পু আপনার চুলের জন্য বিশেষভাবে তৈরী· অতি সহজেই চটপট পরিষ্কার করে দেয়।

সেইজন্যেই আধুনিকা মহিলারা সবসময়েই টাটার শ্যাম্পু ব্যবহার করেন। এর প্রচুর ফেনায় ময়লা ধুয়ে যায় — আর আবার ধোওয়া অবধি এক অপরূপ গন্ধে আপনার চুলকে সুগন্ধিত রাখে।

টাটার শ্যাম্পু

চুলকে আরও পরিষ্কার আরও নরম, আরও চকচকে ও সুগন্ধিত রাখবার জন্য

টাটা-উৎপাদন

একটি কর্ম...
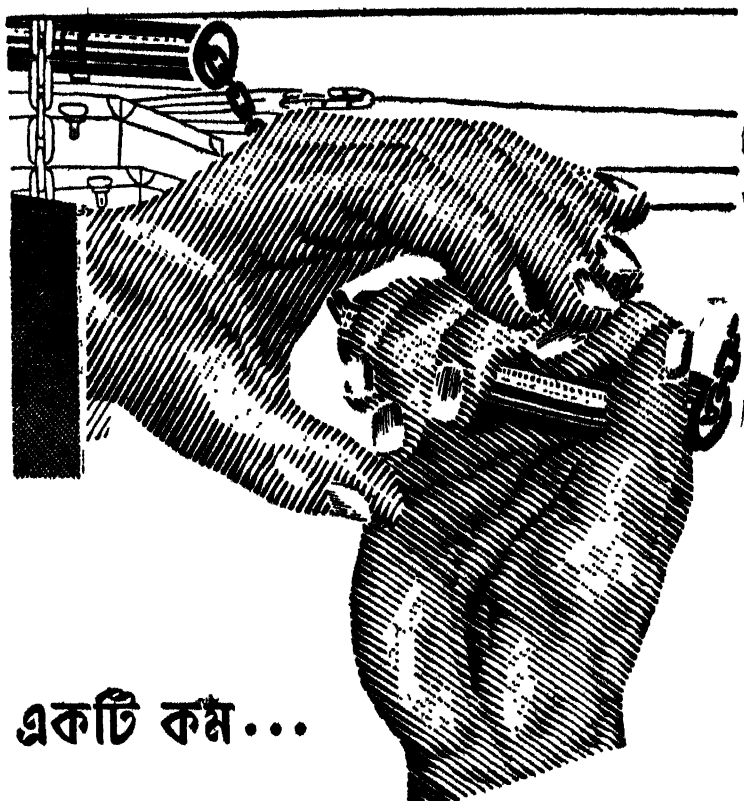
এই রেলওয়েতে ঘণ্টায় দুইবারেরও বেশী বিপদ-শৃঙ্খলের অপব্যবহার হয়।

কিন্তু গুরুত্ব অনেক...

সহযাত্রীদের অসুবিধা কেউ উপলব্ধি করেছেন।

পূর্ব রেলওয়ে

# রেলওয়ের প্রচার মাধ্যমগুলিকে যথাযথ কাজে লাগান

চোখা তীরও সবসময়ে লক্ষ্যভেদ করতে পারে না কিন্তু রেলওয়ের প্রচার-বাহনগুলি সঠিকভাবে লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়।

বিজ্ঞাপনের জন্য খোঁজখবর করুন

**কমার্শিয়াল পাবলিসিটি অফিসার**

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

[illegible]

ঘন সুকৃষ্ণ
কেশগুচ্ছের জন্য
কবিরাজ এন, এন, সেনের
কেশরঞ্জন
তৈল
Keshranjan
OIL
কবিরাজ
এন, এন, সেন এণ্ড
কোং প্রাঃ লিমিটেড
কলিকাতা-১

# উত্তরসূরী

দশম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭০

প্রবন্ধ



কবির ভাষ্য। কবিতাবলী



কবিতা



শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গ



বিদেশী কবিতা



বিয়োগপঞ্জী



সমালোচনা সাহিত্য



আলোচনা



●

**সম্পাদকঃ অরুণ ভট্টাচার্য**

৯বি-৮ কালিচরণ ঘোষ রোড, কলিকাতা-৫০

---

অরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক টেম্পল প্রেস, ২নং ন্যায়রত্ন লেন ও মেট্রোপলিটান প্রিটিং এন্ড পাবলিশিং হাউস প্রাইভেট লিমিটেড, ৭নং চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নৃত্য-পরা মণিপুর, শৌর্য-ভরা জয়পুর অথবা
স্বপ্ন-মাখা কোনারক —মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের
মতো আই-এ-সি সর্বত্রই আপনাকে সত্বর
পৌঁছে দেবে। এই ভাবেই সে বিশাল ভারতের
বিভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা
করতে আপনাকে নিরন্তর সাহায্য করছে।

IAC-48 A BEN

উত্তরসূরী

দশম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭০

# দর্শন বিজ্ঞান ও সৌন্দর্যতত্ত্বে হোয়াইটহেড্-এর অবদান

বিনয় সেনগুপ্ত

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কে একটা অনাগ্রহ, এবং দার্শনিক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সংশয় প্রায় সর্বত্র আরম্ভ হয়েছে। দর্শনশাস্ত্রকে অনেকেই সমাজ বা রাজনীতি-দর্শনে পরিণত করতে চাচ্ছেন। দার্শনিকগণ জগৎ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন, জগতের যে মূল্য আলোচনা করতে চেয়েছেন, তা প্রায় নিরর্থক সমস্যা সৃষ্টির প্রয়াস বলেই আজকাল অনেকে মনে করেন। পদার্থ জগতের অভ্রান্ত সত্যতা বৈজ্ঞানিকগণ সংশয়াতীত ভাবেই প্রমাণ করেছেন। পদার্থের রহস্য, মনের রহস্য, দেহের রহস্য সবই ত বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, সুতরাং এ ছাড়া যে সমস্যা তা আলোচনারই বিষয় নয়! দার্শনিকগণ কেবল সমস্যা সৃষ্টি করেন, সমাধান করেন না—প্রমাণও করেন না!

বিজ্ঞানের এ অপ্রতিহত প্রভাবের মধ্যেই বিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ গণিত পারদর্শী হোয়াইটহেড্ এবং বারট্রান্ড রাসেল এক নূতন দর্শনশাস্ত্র রচনা করেছেন। রাসেল দর্শনকে বিজ্ঞান আশ্রিত করে আলোচনা করেছেন, কিন্তু হোয়াইটহেড্ বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা এবং গতানুগতিক দর্শনের সংকীর্ণতা আলোচনা করেছেন তাঁর দার্শনিক তথ্যে।

হোয়াইটহেডের চিন্তাসূত্র অত্যন্ত গভীর, বিস্তৃত পরিধি নিয়ে তিনি সম্পূর্ণ এক পদ্ধতি সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বিষয়ে আলোচনা করার দায়িত্ব অনেক। তবুও বিজ্ঞানময় জ্ঞানরাজ্যে বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ এমন একজন দার্শনিকের মতবাদ আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি করে।

হোয়াইটহেড্ এবং রাসেল সম্মিলিতভাবে প্রিন্‌সিপিয়া ম্যাথামেটিকা-তে গণিত এবং যুক্তিবিজ্ঞানের মূল প্রত্যয়গুলি নূতনভাবে আলোচনা করেন। এ

গ্রন্থখানি বর্তমান সময়ের একখানা শ্রেষ্ঠ এবং উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধিক অবদান। এ গ্রন্থের পর রাসেলের সঙ্গে হোয়াইটহেড্ মতবাদে আর এক হতে পারেন নি। যদিও উভয়েই দর্শনশাস্ত্র আলোচনা ও রচনা করেছেন কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁরা আর এক হননি। Science and the Modern world, Process and Reality, Adventure of Ideas, The Concept of Life ইত্যাদি গ্রন্থে হোয়াইটহেড্ তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা প্রকাশ করেন।

দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য, প্রকৃতির স্বরূপ, সত্তার (রিয়ালিটি) স্বরূপ সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন।

হোয়াইট্হেডের মতে দার্শনিক চিন্তার তাৎপর্য হল সঙ্গতিপূর্ণ, আবশ্যিক এবং যুক্তিশাস্ত্রানুযায়ী জগৎ ব্যাখ্যার পদ্ধতি সৃষ্টি করা। যান্ত্রিক পদ্ধতির মত জড় পদ্ধতি জ্ঞানের নির্ণায়ক নয়। একটি সামগ্রিকতা বা বৃহত্তর সামান্যতা এতে থাকবে, এতে সমস্ত খণ্ডকে অখণ্ডের পটভূমিকায় ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে।

"Speculative Philosophy is the endeavour to frame a coherent, logical, necessary system of general ideas in terms of which every department of experience can be interpreted."

অবশ্যই এ ব্যাখ্যা বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য এবং পর্যাপ্ত হবে। জ্ঞানদৃষ্টির বুদ্ধির দিক হল সঙ্গতিপূর্ণতা এবং যৌক্তিকতা আর অভিজ্ঞতার দিক হল প্রয়োগযোগ্যতা এবং পর্যাপ্ততা। জ্ঞানক্রিয়া সামান্যকে আশ্রয় করেই হতে পারে, সুতরাং ব্যাখ্যা ব্যক্তিগত কল্পনা বিলাস নয়—সামান্য এবং আবশ্যিক। এ পদ্ধতিকে কাল্পনিক যুক্তিবাদী পদ্ধতি বলা যেতে পারে। ইন্দ্রিয়গম্য, স্পর্শ বা দৃশ্যগম্য বস্তু স্পর্শ বা দর্শন দ্বাবা ব্যাখ্যাত হতে পারে না। এমন একটা কল্পনাবুদ্ধিব সঙ্গে তা অন্তর্লীন আছে, যে সে কল্পনা-বুদ্ধির ব্যাখ্যা বস্তু জগতেও প্রযোজ্য।

কান্টের দর্শনেও এরকম এক কল্পনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এ পদ্ধতি হল গণিতের পদ্ধতি। হোয়াইটহেড্ মনে করেন, গণিতের অনেক সিদ্ধান্ত বহু শত বৎসর পর বাস্তব ক্ষেত্রে প্রমাণ হয়, কিন্তু গণিতের ক্ষেত্রে তারা পূর্বেই প্রমাণিত। বুদ্ধির সঙ্গে বাস্তবের এরকম মিল ঘটাতেই হবে এবং কল্পনা-বুদ্ধি প্রযুক্ত পদ্ধতি এ মিল ঘটাতে সক্ষম।

যুক্তি-নির্ভর ভাববাদী দার্শনিকদের পদ্ধতি আত্যন্তিকতা দোষে সীমাবদ্ধ। অমূর্ত ধারণাকে যখন বাস্তবতার মধ্যে প্রকাশিত বলে ধরা হয়, তখন বিষয়টা অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। হোয়াইটহেড্ একে বলেছেন "ফ্যালাসি অফ্ মিস্প্লেস্ড কন্‌ক্রিট্নেস।" আবার অন্যদিক থেকে, যুক্তিবিজ্ঞানের পদ্ধতির ব্যবহার এবং সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিশ্চিন্ততাও এ পদ্ধতির দোষ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি যুক্তি-

নির্ভর এবং অভিজ্ঞতা নির্ভর। কিন্তু এ পদ্ধতির এক অকারণ অন্ধতা হল, সীমারেখার অন্যপার সম্বন্ধ অজ্ঞতা।

বিজ্ঞান নিজ বিষয়ে বিচার, বিশ্লেষণ করে, কিন্তু বিজ্ঞানোত্তর কোন বিষয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়াচ্ছন্ন, এখানে কোন যুক্তিপ্রয়োগ বিজ্ঞান অবান্তর মনে করে।

দর্শনের পদ্ধতি সম্বন্ধে হোয়াইট্‌হেডের সিদ্ধান্ত, কল্পনাশ্রিত বুদ্ধিই হল দর্শনের ভিত্তি। তিনি প্রচলিত বিচারমূলক বা যুক্তিমূলক পদ্ধতি এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দুইই অস্বীকার করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, তাঁর পদ্ধতি হল গণিতাশ্রয়ী। ডেকার্ত, কান্ট্‌ লাইবনিৎজ্‌ এ পদ্ধতিকেই ভিত্তি করে দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করেছেন।

হোয়াইট্‌হেডের দর্শন সমগ্রতায় বিশ্বাসী। প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় প্রকৃতির যে রূপ পাওয়া যায়, হোয়াইটহেড্‌, সে স্বরূপ নির্ণয়ের যৌক্তিকতা সংশয়হীন সত্য মনে করেন নি।

ষোড়শ শতক থেকেই বুদ্ধিজীবীরা প্রকৃতির ব্যাখ্যা করতে সুরু করেন। এ সময়কার ব্যাখ্যা ছিল সাধারণ বুদ্ধির পর নির্ভরশীল। সাধারণ বুদ্ধি-নির্ভর এসব ব্যাখ্যা প্রকৃতি, গতি, প্রাণ এবং মন সবই আলোচনা করে', পর্যবেক্ষণ করে', তত্ত্বগত ধারণা দেবার চেষ্টা করেছে। বুদ্ধিজীবীদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থও হয়নি। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি-নির্ভর ব্যাখ্যায় বিশ্বের সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত হতে পারে না।

বিজ্ঞানের অগ্রগতিব সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ বুদ্ধি-নির্ভর তথ্যগুলি প্রকৃতি ব্যাখ্যায় অক্ষম বলে প্রমাণিত হতে লাগল। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে—আধুনিক কাল পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় সাধারণ বুদ্ধি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ বুদ্ধি এখনও উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে আছে।

বিজ্ঞান এখন বহু শাখায় বিভক্ত, জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার জন্য, এরূপ বিভাগ-বৃদ্ধি না করে উপায় নেই। কিন্তু বিভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি এক করে, কটি স্নামান্য সিদ্ধান্ত পাওয়া খুবই কঠিন।

পদার্থবিজ্ঞানীরা প্রকৃতির মধ্যে মুখ্য এবং গৌণ গুণ আবিষ্কার করে বর্ণ শব্দকে প্রকৃতি থেকে নির্বাসিত করেছেন। প্রকৃতি এখন খন্ড বস্তুপুঞ্জ; স্থানিক এবং কালিক সম্পর্ক এবং এ সম্পর্কের পরিবর্তন—এভাবেই প্রকৃতি চিত্রিত হচ্ছে।

বিখ্যাত দার্শনিক হিউম সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে সংবেদনলভ্য প্রত্যক্ষতা সংবেদন ব্যাখ্যার পক্ষেও যথেষ্ট নয়। হিউমের এই ব্যাখ্যা দর্শন এবং বিজ্ঞানের

ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নিউটন পদার্থ জগতের ব্যাখ্যায় পূর্বগামীদের তুলনায় অনেক বেশী সার্থকতা লাভ করেছিলেন। কিন্তু তিনি প্রকৃতির অন্তর্নিহিত কোন তাৎপর্য বা মূল্য অনুসন্ধান করেন নি। তিনি পার্থিব বস্তুসমূহের মধ্যে এক আপাতঃ অদৃষ্ট যোগসূত্র মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। কিন্তু এ অন্তঃশীল শক্তির স্বরূপ নির্ণয় করতে চেষ্টা করেন নি।

হোয়াইট্‌হেডের মতে প্রকৃতির সমস্ত ব্যাখ্যাই অসম্পূর্ণ এবং যান্ত্রিক। নিউটন সম্বন্ধে তিনি বলছেন,

"He thus illustrated a great philosophic truth, that a dead nautre can give no reasons. All ultimate reasons are in terms of aim at value."

মানুষের অভিজ্ঞতায় প্রকৃতির যে রূপ অভিব্যক্ত হয় এবং অভিজ্ঞতার যে বৈচিত্র্য, তা বৈজ্ঞানিকদের আলোচনার বাইরে। কিন্তু সমগ্র সত্যতার পক্ষে এ আলোচনা অনস্বীকার্য। অবশ্য হোয়াইটহেড্ বার্কলির মত মন বা অভিজ্ঞতা নির্ভর বিশ্ব প্রমাণ করতে চাচ্ছেন না। কিন্তু "আমার চেতনাব রঙে, পান্না হল সবুজ"—এ কথার তাৎপর্য তিনি অস্বীকার করেন না।

সাম্প্রতিক বিজ্ঞান শক্তি, কর্মচাঞ্চল্য বা গতি এবং স্থানকালের প্রভাব ও এর পরিবর্তনশীল সম্পর্ক দিয়ে পদার্থজগৎ সৃষ্টি করেছে।

"The modern point of view is expresed in terms of energy, activity, and the vibratory differentiation of Space time."

প্রকৃতির এ ব্যাখ্যায় প্রকৃতিকে জড় পদার্থই ধরে নেওয়া হয়েছে। স্থান এবং কালকে অবলম্বন কবে বৈজ্ঞানিক বিচার সুরু হয়েছিল, বর্তমানে পদার্থ-জগৎকে সদা কর্মচঞ্চল, পরিবর্তনশীল সম্বন্ধ দ্বারা পরিচালিত বলে ব্যাখ্যা করা হয়। গণিত-বিজ্ঞানের অধ্যাপক হোয়াইটহেড পদার্থের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর মতে এ কেবল প্রাণহীন প্রকৃতিকে প্রাণহীনভাবে অনুভব করা। প্রকৃতির মধ্যে প্রাণ আছে—প্রাণেব ব্যাখ্যা দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে এক দুরূহ সমস্যা। ডেকার্ত থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন দার্শনিকগণ প্রাণ এবং প্রকৃতির দ্বৈত অস্তিত্বে বিশ্বাস করেছেন এবং বিভিন্নভাবে এদের সম্পর্ক নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। বস্তুবাদীগণ প্রাণকে প্রকৃতি থেকেই উৎপন্ন বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। বাই-প্রোডাক্‌শান্ বা এপিফেনমেনন্ তত্ত্বদ্বারা বস্তুবাদীরা প্রাণ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ আলোচনা করেছেন।

হোয়াইটহেড্ মনে করেন প্রকৃতি ও প্রাণকে কখনও দ্বৈত কল্পনা করা যায় না। প্রকৃতি ও প্রাণের সম্মিলনই হল যথার্থ সত্য—সত্তার এ রূপই বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন করে।

প্রাণ শব্দের তাৎপর্যই আত্ম-আনন্দে। প্রাণ অর্থ হল ব্যক্তি সত্তার প্রত্যক্ষানুভূতি এবং সে সত্তা পদার্থ জগতের জটিল এবং সদাচলমান গতির সঙ্গে এক হতে চায়। হোয়াইটহেড্ ব্যক্তিসত্তার এ সমগ্রতার মধ্যে প্রবেশকে বলেছেন, 'প্রিহেন্শান' এবং প্রত্যক্ষ আত্মোপলব্ধির আনন্দকে বলেছেন 'অকেশান্ অফ্ এক্সপিরিয়েন্স'।

তিনি মনে করেন ব্যক্তি সত্তার বৃহত্তের মধ্যে নিমগ্ন হওয়ার এ আত্ম-উপলব্ধিই ঐক্যবন্ধভাবে বিবর্তমান এবং সদাসৃজনশীল বিশ্বসত্তা গঠন করে। প্রাণশক্তি একটি ক্রমবিকশমান প্রক্রিয়া। প্রতিটি অভিজ্ঞতাই ব্যক্তিসত্তার পক্ষে সৃজনশীল মুহূর্ত। অস্তিত্বের এ উপলব্ধি বৃহৎ সত্তার মধ্যে অনুপলব্ধ কিন্তু অনুভবসম্ভব হয়ে আছে। বিশ্বসত্তার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার মিলনের মুহূর্তকে শুধু সৃজনশীল বললে প্রাণশক্তির অর্থ স্পষ্ট হবে না। এ মিলনের উদ্দেশ্য আছে। এখানে আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য, ব্রহ্মের সঙ্গে মিলন বা পরমমানস সত্তার সঙ্গে মিলনে যে আধ্যাত্মিক রহস্য আছে, হোয়াইট্হেডের আত্মোপলব্ধি ঠিক সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। কারণ অবিমিশ্র মানসসত্তা বলে তাঁর দর্শনে কিছু নেই। কিন্তু তিনি সমস্ত সৃষ্টির একটি অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যে বিশ্বাস করেন। পদার্থ জগতেও এ উদ্দেশ্য আছে। প্রোসেস-ই তাঁর কাছে সত্য—এর মধ্যে ব্যক্তিসত্তার সৃজনশীল আনন্দ এবং বৃহত্তর ঐক্য একই সঙ্গে আছে, এ একটি আকস্মিক ঘটনা নয়। সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য প্রোসেস্-এর মধ্যেই আছে। আমাদের পক্ষে প্রত্যক্ষ ঘটনা হল, আত্মা বা মন গঠনের ঘটনাবলী, আবার আত্মা বা মনও ঘটনার মধ্যেই অস্তিত্বশীল।

বিজ্ঞান প্রকৃতির মধ্যে অবিরাম গতি এবং কর্মচাঞ্চল্য আবিষ্কার করেছে। কিন্তু শূন্য গতি ও আধারহীন কর্মপ্রবাহের অর্থ নেই, তাই প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণকে এক করে দেখতে হবে।

"Our immediate Occasion is in the society of occasions forming the soul, and our soul is in our present occasion."

সুতরাং হোয়াইটহেড্ প্রকৃতিকে জড় প্রকৃতি না ভেবে প্রাণময় প্রকৃতিতে বিশ্বাস করেছেন এবং জড় ও প্রাণের দ্বৈতভাব অস্বীকার করেছেন। প্রকৃতি ও প্রাণের মিলনই সৃষ্টিকে একটি মূল্য দান করেছে।

প্রকৃতি বিষয় হোয়াইট্হেডের বক্তব্যের পরই তাঁর মূল দার্শনিক তথ্য আলোচনা করতে হয়। হোয়াইট্হেডের প্রথম তথ্যগত প্রকল্প হল—অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা স্তরে স্তরে—ক্রমবিকাশমান হয়ে ওঠে। অভিজ্ঞতার প্রতিটি ঘটনার একটি আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আছে।

মানুষ যেমন বর্তমান ঘটনার অভিজ্ঞতাকে অতীতের ঘটনার অভিজ্ঞতার

সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করতে পারে, তেমনি করেই প্রকৃতির আপাতঃ বিচ্ছিন্ন ঘটনা-গুলি পরস্পর সম্পর্কিত হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত ঃ আমরা অনুভব করি যে আমরা স্পন্দিত বাস্তব জগতে বাস করি। প্রত্যক্ষভাবে বাস্তব জগতে স্পন্দন অনুভব করাই দার্শনিক অনুভূতি। তৃতীয়ত ঃ হোয়াইটহেড্ মনে করেন অন্তর্নিহিত মূল্য বিশেষ কোন শ্রেণীর জন্য নয়, অস্তিত্বের অতি সামান্য জিনিস ও অন্তর্নিহিত মূল্যে মূল্যবান। অস্তিত্বে এবং মূল্যে দ্বৈত নেই।

ঘটনার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই প্রকৃত সত্তা বিবর্তিত হয়। হোয়াইটহেড্ প্রতিটি প্রত্যক্ষ মুহূর্তকেই সত্য এবং রূপ ও ভাবময় বলে মনে করেছেন।

প্রকৃত সত্তাকে তিনি অভিজ্ঞতার আধার বলে প্রমাণ করেছেন। অভিজ্ঞতার দার্শনিক তাৎপর্য হল অনেকের মধ্যে নিজেকে ব্যক্তি হিসাবে অনুভব করার আনন্দ এবং ব্যক্তিসত্তা যে বহু থেকে জাগ্রত হয়েছে তাও অনুভব করা। একের সঙ্গে বহুর এ ঐক্যকে তিনি বলেছেন প্রিহেনশান্ অর্থাৎ অনুভব করা।

হোয়াইটহেড্ সচেতন মন এবং বিষয় সংক্রান্ত সমস্যাটি প্রায় এড়িয়ে গেছেন। তাঁর প্রিহেনশান্ দ্বিততাব ঊর্ধে। তিনি পরিবেশ এবং চৈতন্য বা অনুভব দুই-ই অদ্বৈত হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে অনুভব গতিহীন নয়, অনুভূতির শক্তি আছে, তিনি একে বলেছেন, 'ভেক্টরস্' বিজ্ঞানেব বা গণিতের ভাষায় ভেলোসিটি। আমাদেব প্রত্যেক অভিজ্ঞতা আমাদের নিজস্ব অথচ তাবা আসে একেবারেই বাইরের ঘটনা থেকে। অনুভূতির ভেলোসিটি-র জন্যই এবকম সম্ভব হতে পারে। প্রিহেনশান্ ও স্থির নয়, প্রত্যেক অভিজ্ঞতায়ই একটি পূর্ববর্তী ঘটনার ইঙ্গিত আছে অথচ তা বর্তমানও বটে। ঘটনাগুলি বিষয়ের জগৎ থেকে অভিজ্ঞতার জগতে এসে সাবজেক্ট-এ পরিণত হয়। কান্ট অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ ক্যাটিগোরিস্ দ্বারা বিষয় ব্যাখ্যা কবেছেন, হোয়াইটহেড বিষয় থেকে সুরু করে বিষয়ী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। হোয়াইট্‌হেডের মতে সাব্‌জেক্ট-এর কোন অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ পূর্ব সত্তা নেই, বা বাইরের কোন উৎস থেকে সৃষ্ট নয়, অভিজ্ঞতার প্রোসেস্-এর মধ্যে সাব্‌জেক্ট সৃষ্ট হয়।

হোয়াইটহেড্ সত্তার স্বরূপকে ক্রমবিকাশ এবং ক্রমপরিণতির দ্বারা প্রকাশ করেছেন। প্রকৃত ঘটনা শেষ হলেই, সৃজন উন্মুখ বিশ্বে আবার নূতন ঘটনার সৃষ্টি হয় এবং এ ঘটনাগুলিই বিষয় হয়ে ভবিষ্যৎ ঘটনার জন্য থাকে।

ভবিষ্যতের ঘটনাগুলি পূর্ববর্তী ঘটনাগুলিকে তাদের কারণ বলে চিহ্নিত করবে। এভাবে তিনি সময়কে প্রাণ, গতি এবং অনুভূতি দ্বারা অপূর্ব এক রূপদান করেন। তিনি আকার এবং বাস্তবে কোন দ্বৈতভাব স্বীকার করেন

না। এমন কি গণিতের সূত্রকেও তিনি সত্তার বিকাশ প্রক্রিয়ায় বাস্তবে মূর্ত হবে বলে বিশ্বাস করেন।

হোয়াইটহেড্ প্রধানতঃ গতিবাদী, কিন্তু তাঁর মতে বিশ্বের মূল উপাদান-গুলির গুণ পরিবর্তন হয়। কিন্তু মূল সত্তার পরিবর্তন হয় না। কারণ বিশ্বের তাৎপর্য হল আত্মোপলব্ধিতে, প্রকৃত ঘটনার আত্ম-উপলব্ধি হলেই বিনাশ হয়। আবার নূতন ঘটনা আসে। প্রকৃতিতে পার্থক্য থাকার কারণ ঘটনাগুলি বিভিন্ন ধরণের লক্ষণের মধ্যে থাকে। প্রোসেস এ্যাণ্ড রিয়ালিটি গ্রন্থে তিনি সাতাশটি ব্যাখ্যার সূত্র এবং ন'টি অনুশাসন সূত্র (27 Categories of explanation, 9 Categories of obligation) ব্যবহার করেছেন। এ ব্যাখ্যার মাধ্যমেই তিনি তাঁর ফিলোসফি অফ্ অরগানইজিম্ প্রমাণ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে দুটি প্রকৃত সত্তা একই উৎস থেকে আসতে পারে না। একটি ক্রমবিকাশমান দার্শনিক পদ্ধতি এরকম একটি সূত্র মেনে নেবেই।

তিনি আপেক্ষিক তত্ত্বে সমস্ত জিনিসকেই অস্তিত্বের দিক থেকে আপেক্ষিক ভাবে বিচার কবেছেন। যে কোন বকম অস্তিত্বই, ভবিষ্যতে হয়ে ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে অনুভব করতে হবে। সুতরাং হোয়াইট্হেডের জগৎ চিন্তায় অনুভব একটি অপরিহার্য অঙ্গ। তিনি বলেন,—

"There is nothing in the real world which is merely an inert fact. Every reality there is for feeling, it promotes feeling and it is felt."

ঘটনা, অভিজ্ঞতা, সত্তা ইত্যাদির আলোচনা থেকে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে হোয়াইট্হেডের মতে চরমসত্তাব স্বরূপ কি? অবিরাম কর্মচাঞ্চল্যে, ঘটনাস্রোতে কার উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে? তিনি উত্তর দেবেন—"ভগবান"। কিন্তু এ ভগবান জগৎ স্রষ্টা নন, বা সৃষ্টির আগে তাঁর কোন অস্তিত্ব নেই, তিনি বিশ্বময়। তিনি ঘটনা এবং অভিজ্ঞতার গতি, অতীত থেকে বর্তমানে আসবার ঐক্যবদ্ধ চেষ্টা দিয়েই পৃথিবী ব্যাখ্যা করতে পারতেন। কিন্তু তাতে বস্তুবাদীতা হোত। বর্তমান কি নূতন পাত্রে অতীত? তাই তিনি ভগবানের সাহায্যে নূতনত্ব এবং সদা গতিবান হওয়ার দুর্বার সাহস সৃষ্টি করলেন। ঘটনার ধারাবাহিকতার মধ্যে অতীত ঘটনা ক্রমশঃ বিস্মবণ হয়, কিন্তু একেবারে বিস্মৃতির অতলের মধ্যে সে কখনও যায় না। সেজন্য, নূতন ঘটনা থেকে সৃষ্ট প্রথম ভাগে পুরাতনের জন্য সমবেদনা, তারপর সমবেদনার স্তর পার হয়ে ঘটনা ব্যক্তিসত্তাকে নূতন কিছু দান কবে, এভাবে এক জটিল অনুভূতিব রাজ্য তৈরী হয়—কিন্তু এ জটিলতাই সৃজনশীল আগ্রহ সৃষ্টি করে। হোয়াইটহেড্ পদার্থ থেকে আসা অনুভূতি এবং প্রত্যয়জনিত অনুভূতিতে বিশেষ কোন পার্থক্য

করেন নি। তিনি বলেন, প্রকৃত ঘটনায় প্রত্যয়জনিত অনুভূতিই পদার্থের অনুভূতির ন্যায় প্রতিভাত হয়। এ ভাবে তিনি বাস্তব ও মানসিককে এক করেন।

হোয়াইট্‌হেডের দর্শনে উদ্দেশ্যবাদ এবং সৃষ্টির কারণতত্ত্ব এক সূত্রে আবদ্ধ। ঘটনার অতীত থেকে বর্তমান, এবং বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে হয়ে ওঠা হল কারণতত্ত্বের ব্যাখ্যা। আর হয়ে ওঠার মধ্যে যে উদ্দেশ্য রয়েছে সে উদ্দেশ্য হল 'আত্ম-উপলব্ধি'—এটি হল উদ্দেশ্যবাদ।

ক্যাটিগোরিক্যাল অবলিগেশান্‌-এর প্রধান তত্ত্ব হল প্রতি অভিজ্ঞতাই ঐক্যবদ্ধ বোধের মধ্যে অস্তিত্বশীল। প্রতি ঘটনার নিজস্ব উদ্দেশ্য আছে, আবার বৃহতের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে ঘটনাগুলি সৃজনশীল উদ্যম এবং সর্বোপরি একটি বোধ সৃষ্টি করে।

পদার্থবিজ্ঞানীরা এনারজি-কে সত্তার পরমস্ফুরণ বলে মনে করেন হোয়াইট্‌-হেড্‌ ফিজিক্যাল এনারজি-কে অমূর্ত এবং অস্পষ্ট বলেন, তাই তিনি উদ্দেশ্য যোগ করেছেন।

হোয়াইট্‌হেডের উদ্দেশ্যবাদে ঈশ্বরের ইচ্ছা, মানুষকে আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত করা নেই। ঘটনার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতে সৃজনশীল বোধের ক্রমবিকাশ এবং চিরদিনই ক্রমবিকাশের মধ্যে আত্মার আনন্দ ও আত্মার অস্তিত্ববোধ, এই-ই উদ্দেশ্যবাদ। উদ্দেশ্যবাদকে তিনি শেষপর্যন্ত সৌন্দর্যতত্ত্বে পরিণত করেছেন। ঘটনার অভিজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত সত্তার আনন্দ ও আত্মবোধ এক অর্থে সৌন্দর্যবোধেরই অভিজ্ঞতা। হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদের পরিবর্তে, হোয়াইট্‌হেডের মতে সমন্বয় হল সৌন্দর্য। ভাবের আকারে বৈপরীত্য এবং এ আকারের সঙ্গে ঘটনার বৈপরীত্য সমন্বিত হয় সৌন্দর্যতত্ত্বে। হোয়াইট-হেড্‌ তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা দিয়ে সমাজ পদ্ধতিও বিশ্লেষণ করেন। তাঁর অরগানিজম্‌ সদা গতিশীল থাকা, হয়ে ওঠার অনন্ত ঘটনাই ত ইতিহাস—সত্তাও তাই। সুতরাং প্রত্যেক ঘটনাকেই তার হয়ে ওঠা এবং বিনাশ হওয়া দুই দিক থেকেই দেখতে হবে। অরগানিক্‌ প্রোসেস্‌-এর মধ্যে পদার্থের এবং মনের দিক এক হয়ে আছে। অতীতের বিলীয়মানতা এবং নূতন সৃষ্ট পদার্থের স্বরূপ, আর এ থেকে ভাবগত সম্পদ আহরণ হল মানসিক। আত্মা এ থেকে সমন্বয় করে একটি নূতন অবস্থা তৈরী করে।

প্রতি ঘটনাই সীমাবদ্ধ। সম্পূর্ণ ঐক্যতানিক কোন সমগ্রতা নেই। সুতরাং সভ্যতার উন্নতি, অবনতি ও ধ্বংস অনিবার্য। হোয়াইটহেড্‌ মনে করেন যখনই নূতন কিছু ভাববার বা করবার ক্ষমতা কোন সভ্যতার শেষ হয়ে যায়—তখনই সভ্যতার পতনের কাল সূচিত হয়। পৃথিবী সর্বদাই নূতন সম্ভাবনায় উজ্জ্বল হয়ে থাকে। অনাগতকে মনের ধারণায় সৃষ্টি করে, বাস্তবে তাকে আনতে হয়,

একেই তিনি বলেছেন এ্যাড্‌ভেনচার। প্রাণবন্ত সভ্যতা সব সময়ই চিন্তার ক্ষেত্রে বর্তমানকে ছাড়িয়ে যায়। এ গুণ নষ্ট হলেই সভ্যতার পতন অনিবার্য।

দার্শনিক হিসাবে হোয়াইটহেড্‌ সমগ্রতাপন্থী। অরগানিজম্‌-এর দৃষ্টিতে সৃষ্টি রহস্য প্রকাশ করেছেন। তিনি একটি চলমান সত্তার চিত্র কল্পনা করেছেন। গতানুগতিক কোন মতবাদের মধ্যে তাঁর চিন্তা সীমাবদ্ধ নয়। ভাববাদী, বস্তুবাদী, বস্তুস্বাতন্ত্রবাদী কোন নামেই তাঁর দর্শনকে পরিচয় কবানো যায় না। তিনি বহুসত্ত্বাবাদী, অথচ তিনি পরস্পর নির্ভরশীলতার বিষয়ে একসত্তাবাদীদের চেয়ে বেশী বলেছেন। তাঁর অবগানিজম্‌ সাংখ্য দর্শনের ক্রমবিকাশের মত তবে পুরুষ প্রকৃতির পরিবর্তে এখানে আছে, অকেশান্‌, এক্‌চুয়েল এনটিটি, এইম এ্যাকটিভিটি এবং সর্বোপরি একটি উদ্দেশ্যবাদ। তিনি দ্বৈতবাদকে স্বীকার করেন নি, দেহ, মন, পদার্থ ও আত্মার মধ্যে একটি ঐক্যসূত্র আবিষ্কার কবেছেন। তিনি গতানুগতিক দার্শনিক সমস্যাকে নূতনভাবে এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তাঁর এক একটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে একখানা গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব। চিন্তার গভীরতায়, বিজ্ঞান ও দর্শন জ্ঞানের সমন্বয় সাধনায় হোযাইটহেড্‌ বর্তমান শতাব্দীর বিস্ময়।

হোয়াইট্‌হেড্‌ বিশ্বসৃষ্টির রহস্য অতীন্দ্রিয় কোন সত্ত্বার মাধ্যমে প্রকাশ করেন নি। যা আছে সব পৃথিবীতেই আছে, কিন্তু তাব মধ্যেও চিরচঞ্চল গতি, চির প্রকাশমান বিবর্ত্তন, এবং সৃজনশীল অনুভূতি ও ঘটনার অভিজ্ঞতার ঐক্যতান রয়েছে। স্থির, অচঞ্চল জগতেরই উপাদান চিবচঞ্চল হয়ে ক্রমবিকশিত হচ্ছে—এ ধারাব কোন অন্ত নেই। হোয়াইট্‌হেড্‌ শিল্প, সাহিত্য, সভ্যতা শান্তি সবই, দার্শনিক দৃষ্টিতে বিচার করেছেন। বিজ্ঞানের একান্ত বিষয়মুখিনতা, ভাববাদের আত্মমগ্নতা দুই-ই তিনি অস্বীকার করেন। অভিজ্ঞতার সৃজনশীল স্পন্দন দ্বারা তিনি দেশ, কালের শূন্যতা পূর্ণ করেছেন। জীবনের মূল্যবোধকে তিনি নীতিশাস্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে জগতের মূল তত্ত্বের মধ্যে মিলিয়ে দিয়েছেন। তাঁর দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে একজন সমালোচক লিখছেন—

"In this philosophy, the basic fact is everywhere some process of self-realisation, which grows out of previous process, and itself adds a new pulse of individuality and a new value to the world."

বাস্তবিক, হোয়াইট্‌হেড্‌ সর্বত্র আত্মোপলব্ধির এবং ব্যক্তিসত্ত্বার বিকাশের নিত্য নূতন সম্ভাবনার ও পৃথিবীর নূতন মূল্যায়নের বিষয় লিখেছেন। তাঁর আঙ্গিকের কাঠিন্য ভেদ করে তাঁর রসবোধ এবং অন্তর্দৃষ্টি সব সময়ই প্রকাশিত॥

## ভগ্নসেতু

( পূর্বানুবৃত্তি )

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

"reclined laterally, left, with right and left legs flexed, the indexfinger and thumb of the right hand resting on the bridge of the nose, in the attitude depicted on a snapshot photograph made by Percy Apjohn, the childman weary, the manchild in the womb.

Womb? Weary?

He rests. He has travelled."

যার বর্ণনা এখানে জয়স দিয়েছেন সে আধুনিক কালের অডিসিউস। তার হৃদয় বিধ্বস্ত, আশা ধূলিসাৎ। পেশা বিজ্ঞাপনের দালালি। সেই সূত্রে ১৯০৪-এর ১৬ই জুন সারাদিন বুকের মধ্যে বিবিক্তির বেদনা নিয়ে ডাবলিন শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে। ডাবলিনই তাব বিশ্ব। এই বিশ্ব পরিক্রমার অন্তে ঘরে ফিরে এসেছে ক্লান্ত হয়ে। পাশে তার স্ত্রী, তার পেনিলোপ শুয়ে কিন্তু তবু সে নিঃসঙ্গ। আধুনিক অডিসিউসের নাম শ্রীযুক্ত লিযোপোল্ড ব্লুম, একজন নিষ্ফল নাগরিক। ব্যক্তি ও বিশ্ব এবং বিশ্ব ও ঈশ্বরের মধ্যেকার ঐক্য ও সামঞ্জস্য যেকালে বিলুপ্ত, যেকালে সবরকম মূল্যবোধ বিপর্যস্ত, পরিবেশ ও প্রতারণার ফাঁদে মানুষ বন্দী, আত্মিক মুক্তির অন্বেষণ যখন অনর্থক ব্লুম সেই যুগের প্রতীক, তার শুয়ে থাকার ভঙ্গিটি সেই যুগের পরাজিত শৃঙ্খলিত মানুষের ছবি।

আধুনিককালের যে-বিঘটন জেমস জয়সের "ইউলিসিস" তার অনবদ্য ভাষ্য এ-বিশ্ব যেন এক বিশাল রঙ্গমঞ্চ, নাটকের নায়ক-নায়িকা বলে কিছু নেই, সবাই জনতা এবং তাদের কেউই জানে না কার কোন ভূমিকা। লেখকের নিজের কি কোনও ভূমিকা নেই? যদি স্টিফেন ডেডলাস লেখকেরই প্রতিরূপ হয়ে থাকে তা হলে বলতে হবে অন্য এক মঞ্চে অন্য কোনও নাটকে গৌরবময় তার যে-ভূমিকা ছিল এই মঞ্চেও সেই একই নামে একই ভূমিকা অভিনয় করবে বলে সে কৃতসংকল্প। কিন্তু রঙ্গমঞ্চের রূপকটি যদি যথার্থ হয় তবে মানতে হবে যে,

মঞ্চস্থ জনতার দশা দেখে জয়স স্বরুচি, প্রবণতা ও শক্তি অনুসারে, একটা ভূমিকা নিজের জন্যে তৈরি করে নিয়েছেন। ভূমিকাটি বিদূষকের। সকলের অঙ্গভঙ্গি, সকলের বিভ্রান্তি তিনি খুঁটিনাটিসহ নকল করে দেখাচ্ছেন মাত্র। কিন্তু যাদেব নকল করেছেন তারা বুঝতে পারছে না যে আয়নায় নিজেদেরই দেখছে, তারা এটাকে ভাবছে তামাশা। বিদূষকের চোখে যে ধারা বইছে সেটা তাদের চোখে পড়ছে না।

অথচ কথা ছিল এক মহিমান্বিত নাটক অভিনীত হবে। চোখের সামনে সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। জয়স সেই বাগানের মালী, ঝাঁট দিয়ে তিনি ঝরা পাতাগুলো এক স্থানে জড়ো করেছেন। বাগান হলো আধুনিক পৃথিবী আর ঝরা পাতা আমাদেব জীর্ণ মূল্যবোধ। এখন এমন একটা যুগ যখন মানুষকে একা একা অচেনা পথে অন্ধকারে হাতরে হাতরে চলতে হবে, যখন সব কিছু অনুপাত ও ব্যবধান একাকার হয়ে গেছে, যখন সব কিছু অস্থির ও অনিশ্চিত, প্রাক্তন ও বর্তমান যখন সম্পর্কশূন্য। আর এই বিশৃঙ্খলার মধ্য হতে জয়সের শিল্পকর্ম গড়ে উঠেছে, কুমোরেব চাকা থেকে যেমনভাবে কাদার তাল উঠে এসে নেয় নির্দিষ্ট ও সুসম আকার।

জয়স এমন এক প্রকরণ আবিষ্কার করেছেন যা তাঁর কাল ও বিষয়ের পক্ষে প্রকৃষ্ট। "ইউলিসিস" যদিও অবক্ষয়ের যুগকে কাহিনীরূপ দিয়েছে তবুও তা হতাশা ও নেতিবাদেব মহাকাব্য নয়, এমন কি আর্ত আত্মার নাটকও নয়। শুধু এপর্যন্ত বলা যায় যে, উপন্যাসের চবিত্রগুলি সমকালীন মানবিক পবিস্থিতির দ্বারা উপদ্রুত। প্রকৃতপক্ষে তারা সকলেই নিতান্ত সাধারণ মানুষ, নায়ক বা নায়িকা হবাব মতো কোনও গুণেই তাদের নেই। অন্য যে কোনও উপন্যাসের পাত্রপাত্রীর চাইতে স্টিফেন, লিয়োপোল্ড অথবা মলিকে আমরা দিনের শেষে অনেক বেশী অন্তরঙ্গভাবেই জানতে পারি। যদিও ডিকেন্স বা দস্তয়ভস্কি অঙ্কিত চরিত্রগুলির মতো আমবা তাদের ভালোবাসতে পাবিনে। অথবা এমা বোভারির মতো সুস্পষ্ট রেখায় তারা পাঠকের সম্মুখে এসে দাঁড়ায না। এর কারণ বোধকরি এই যে জয়সের চরিত্রগুলিকে আমরা বাইরে থেকে দেখবার সুযোগ পাইনি। উপযুক্ত পবিপ্রেক্ষিতে দেখবার জন্যে যতটা দূরত্ব উপন্যাসের চরিত্র ও পাঠকের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয় তা রক্ষা করতে "ইউলিসিস"-এর লেখক একান্ত অনীহ। কতটুকু সময়ের জন্যেই বা উপন্যাসের প্রধান তিনটি চরিত্রকে আমরা একত্রে দেখতে পাই? কিছুক্ষণের জন্যে বেলা কোহেনের প্রমোদালয়ে, পরবর্তী দীর্ঘ পরিচ্ছেদে গাড়ি-চালকদের আড্ডায় এবং উভয়ের তর্ক-বিতর্ক ও কথোপকথনের পরিচ্ছেদে স্টিফেন ও লিয়োপোল্ডের সাক্ষাৎ হয়। সেখানে তারা দুজনেই মাতাল ও দুজনেই নিজের নিজের জগতে মগ্ন। গ্রন্থের শেষে

যেন বিচ্ছিন্নভাবে যোজনা করা হয়েছে মলি ব্লুমের জটিল চেতনাপ্রবাহ। চরিত্র-গুলোকে এভাবে আলাদা আলাদা করে উপস্থাপনার পেছনে লেখকের সচেতন পরিকল্পনা সক্রিয়। স্ব স্ব চেতনায় আবৃত হয়ে একালে ব্যক্তিস্বরূপ যেরূপ পরিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে তাকেই প্রকট করে তোলা এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

কিন্তু তারা নিঃসঙ্গ হয়েও এমন কোনও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয় যা তাদের সমাজ ও শ্রেণী হতে বিচ্ছিন্ন বা সম্পর্কশূন্য করতে পারে। বরং আপন যুগের প্রতি তাদের আনুগত্য আপন শ্রেণীর প্রতি তাদের বিশ্বস্ততা সর্বদাই প্রশ্নাতীত। যেহেতু তারা বিশিষ্ট নয়, তারা জনতারই অন্তর্গত, তাই তাদের ব্যক্তিস্বরূপ চিনতে ও বুঝতে সময় লাগে। স্টিফেন ও লিয়োপোল্ডের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে, তাদের সম্পর্কে অভিজ্ঞতা জড়ো করতে করতে তাদের জীবনের ও বিশ্ব-নগর ডাবলিনের পথে পথে তাদেব নিঃসঙ্গ ভ্রমণের সম্পূর্ণ চিত্র আমরা পাই। তাদের সঙ্গে সারাটি দিন অতিবাহিত করার ফলে আস্তে আস্তে তাদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা জন্ম নেয়, আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পায়। ঐকান্তিক নির্লিপ্তির সঙ্গে জয়স স্বীকার করেছেন মানুষের অসম্পূর্ণতাকে। যেসব চরিত্রকে তিনি উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন সে সবই খণ্ডিত, কিন্তু যে-চিত্র তিনি এঁকেছেন তা সম্পূর্ণ। "ইউলিসিস"-এব গঠন কৌশল, প্রকরণ, ভাষার সম্পদ, ধ্বনির মূর্চ্ছনা—এসব কোনও কিছুর মধ্যেই সাধাবণত্বের একটি কণাও নেই, কিন্তু পাঠককে যা অভিভূত কবে তা হলো সাধারণ মানুষের জন্যে জয়েসেব অনন্য প্রক্ষোভ, সেই প্রক্ষোভের সার্বভৌম আন্তরিকতা, তাব গভীরতা ও বিস্তার। স্টিফেনের বিশ্লেষণী উক্তিতে "ইউলিসিস" একটি "শিফ্ট ফ্রম দি পারসোনাল্ টু এপিক্", শিল্পীর জগৎ হতে অপসবণ তথা সাধারণ মানুষের আত্মার অন্বেষণ।

সত্যি বলতে, বিশেষ ক'জন মানুষ নয়, আমরা যে জীববংশকে মানব আখ্যায় চিহ্নিত করি তা-ই জয়সের আগ্রহের বিষয়। এই মানবের কাল যেমন অন্তহীন তেমনই তার জীবন পুনঃপুনঃ চক্রাবর্তনের সমষ্টি। আর সেই জীবন অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু যোগ করেছে যে-সেতুটি তা গাঁথা হয়েছে অসংখ্য পৌরাণিক ও লৌকিক উপাখ্যানে, ওই জন্ম-মৃত্যুর প্রক্রিয়াজাত জাতি-ও-ব্যক্তি-গত স্মৃতি দিয়ে। অনাদি অনন্তকালের পটে অতীত বর্তমান এমন কি ভবিষ্যৎ আর ওইসব পূর্বোক্ত চক্র ফুটে উঠছে, আবার যাচ্ছে মিলিয়ে। যেমন "ইউলিসিস"-এ তেমনই তাঁর সর্বশেষ বৃহৎ রচনা "ফিনেগানস্ ওয়েক"-এ যে জটিল অবিচ্ছিন্ন ধারা-বাহিক চিন্তার স্রোত বা চেতনাপ্রবাহকে ভাষার ফাঁদ পেতে ধরেছেন তা আসলে তো সংখ্যাহীন স্মৃতির পুঞ্জ এবং তার মধ্য হতে উত্থিত অতীতের অভিজ্ঞতা ক্রমাগত মিশে গেছে বর্তমানের অভিজ্ঞতার সঙ্গে; তারপরে সেই বর্তমানই

নির্ধারণ করেছে ভবিষ্যৎকে। এইভাবে বহুদিন আগে ফেলে আসা কোনও ঘটনা বা উপলব্ধিকে কুড়িয়ে এনে স্মৃতি তা সমর্পণ করে বর্তমানের হাতে তখন তা পুনরায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাৎক্ষণিকের উজ্জ্বল আলোতে। একই সময়চেতনা রূপ পেয়েছে টি এস এলিয়টের কাব্যেও :

Time present and Time past
Are both perhaps present in time future
And time future contained in time past.

যেকালে বর্তমান উদভ্রান্ত ও বৈনাশিক, ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা ও হতাশায় আক্রান্ত তখনই অতীত এসে আচ্ছন্ন করে মানুষকে। পলাতক বিগত দিবসের জন্যে বিষাদ চেখভ বা মেটারলিঙ্কের রচনাতে গোধূলির করুণ আলোতে রঞ্জিত, কিন্তু জয়স বা প্রুস্ত, কিংবা মান অথবা ফকনরের রচনাতে কাল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মূল্যে বিধৃত। অবশ্য জয়স যাকে "এপিফানি" বলেছেন যা বর্তমানের প্রতিটি অপস্রিয়মান মুহূর্তকেও আটক করে আবার ভূত ও ভবিষ্যৎকেও একটি অভিজ্ঞতার বিন্দুতে বিলীন করে দেয় তার সঙ্গে প্রুস্তের সময়কে ব্যবহারের পদ্ধতি মেলে না। শেষোক্ত লেখকের কাছে বর্তমান রিক্ত, অসহনীয়, একমাত্র আশ্রয় অতীত, শব্দহীন অন্ধকার ঘরে আপন প্রাক্তন ব্যতীত তাঁর আর কোনও অবলম্বন ছিল না, স্মৃতিই তাঁর অদ্বিতীয় সঙ্গী। অতীতের অভিজ্ঞতা ফিরে এসেছে প্রুস্তের রচনাতে, কিন্তু সে-প্রত্যাবর্তন ক্ষণস্থায়ী, আবার তা ঝরে পড়েছে স্মরণের স্তবে। পক্ষান্তরে উইলিয়ম ফকনরের "দি সাউন্ড অ্যান্ড ফিউরি" আপাত চোখে বেনজি, কোয়েনটিন ও জেসন কম্পসনের লিপিবদ্ধ তিনটি ধারাবাহিক চিন্তাস্রোত—এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বিবৃত হয়েছে কম্পসন পরিবারের অবক্ষয়ের কাহিনী—কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসটিতে লেখকের প্রামাণ্য বিষয় হলো বর্তমান কর্তৃক প্রাক্তনের বিনাশ। এই সর্বধ্বংসী বর্তমানকে রুখবে কে? কোয়েনটিন পাগলের মতো পৈতৃক ঘড়ির কাঁটা দুটো ভেঙে অস্বীকার করতে চেয়েছে বর্তমানের অপ্রতিরোধ্য পদক্ষেপ। হায়, সে কি জানত যে ওই পদক্ষেপ স্তব্ধ হলে তার হৃৎপিণ্ডের শব্দও থেমে যাবে! কোয়েনটিনের মৃত্যুর তাৎপর্য হলো অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষায় অনিবার্য ব্যর্থতা। যে বিচ্ছেদ অসেতুসম্ভব তার মধ্যে মিলন ঘটাবার চেষ্টায় আত্মক্ষয় না করে প্রুস্ত অতীতকেই সত্য বলে মেনেছেন; তাঁর উপন্যাসের নায়ক সোয়ান কখনোই সময়কে পরাস্ত করার জন্যে ক্ষেপে যায়নি, কারণ সে জানে যাকে আমরা বর্তমান বলি তা-ও একদিন হবে স্মৃতির খাদ্য এবং ততদিন অপেক্ষা করাই বুদ্ধিমানের কর্তব্য।

বিষাদ নয়, বর্তমানের সর্বধ্বংসী অভিযানের দরুন বিলাপ টমাস মানের

প্রথম জীবনের রচনাবলীকে মর্মস্পর্শী করেছে। জয়সের যেমন স্টিফেন ডেডলাস তেমনই মানের আঁকা চরিত্রগুলির মধ্যে টোনিয়ো ক্রোগার, গুস্তফ আশেনবাখ, হান্স কাস্ট্রপ প্রভৃতি চরিত্র—এদের সমস্যা হলো একান্তভাবে শিল্পীর। ক্রূর স্থূল বাস্তব তথা বিভীষিকাময় বর্তমানের প্লাবন হতে নিষ্কৃতির জন্যে তাঁর শিল্পী-চরিত্রগুলোকে মান্ পলায়নে প্ররোচনা দিয়েছেন, তারাও বিমুগ্ধ পর্বতের শিখরে আরোহণ করে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারা ভারসাম্য রক্ষা করতে না পেরে হয় আশেনবাখের মতো ওই কুহকের স্বর্গে মৃত্যুবরণ করেছে, নতুবা কাস্ট্রপের মতো বাধ্য হয়েছে সমতল রণক্ষেত্রে অবতরণে। এবং একথা এখানে দাগিয়ে বলে রাখা ভালো যে ওই অবতরণ, শুধু মানের সাহিত্যে নয়, সমগ্র আধুনিক সাহিত্যে অশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ডেটলেফ স্পিনেল ও শ্রীমতী ক্লোটেরইহান তাদের প্রবল প্রতাপান্বিত বস্তুবাদী স্বজনদের হাত এড়িয়ে আশ্রয় খুঁজেছে "ট্রিস্টান" সঙ্গীতের স্বপ্নরাজ্যে, যেমন হাগেনস্ট্রোম-এর উৎপাত থেকে টমাস ও হানো বাডেনব্রুক পলায়ন করেছে শোপেনহাওয়ারের সর্বেশ্বরবাদ দর্শনে ও ওয়াগনারের বাত্যাক্ষুব্ধ সঙ্গীতের উল্লাসে। কিন্তু জার্মান কাল্চার বা প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে নিরাপদ স্থিতির অন্বেষণে যাথার্থ কতটুকু। সৌন্দর্যের জগতে ক্রোগার যে-সান্ত্বনা লাভ করেছে তা আক্ষেপমুক্ত নয়; আর শোপেনহাওয়ারের কাছ হতে টমাস যে-শান্তি পেয়েছে তা-ও ক্ষণস্থায়ী, পায়ের তলা থেকে অতীতের মাটি সরে যাবার পরিণামে তার মৃত্যু। অতএব প্রাচীন সংস্কৃতিতে অব্যাহতির অন্বেষণ অর্থহীন; তাতে কারও কারও পক্ষে সাময়িক উপশম হয় বটে, কিন্তু সত্যি সত্যি তার এমন কোনও ঐন্দ্রজালিক শক্তি নেই যা উপস্থিত প্লাবন থেকে মানবসমাজকে রক্ষা করতে পারে; অর্থাৎ আধুনিক ব্যক্তির জন্যে কাস্ট্রপের মতো বিমুগ্ধ পর্বত হতে নেমে সমস্যার মুখোমুখি হওয়া ছাড়া আর কোনও গতি নেই।

এই সাম্প্রতিক সীমাবদ্ধতা অনুধাবনেই জয়স অন্বেষণ করেছেন সেই সকল পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনী যা সময়কে উত্তীর্ণ করবে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ঊর্ধ্বে, যার অনাদ্যন্ত বিশ্বসত্ত্বে বিধৃত হবে সব দেশের সব কালের মানবজীবন। তাই লিয়োপোল্ড ব্লুম "এভরিম্যান অর্ নোম্যান", জন্মসূত্রে আইরিশ হলেও সে আসলে চিরকালের ভ্রাম্যমান ইহুদী ও অডিসিউস, "গ্রেট্ প্রব্লেমস্ আর ইন্ দি স্ট্রীট"—নীটশের এই অমোঘ সত্যের জ্বলন্ত সাক্ষ্য পক্ষান্তরে স্টিফেন ডেডলাস একজন আইরিশ কবি হয়েও এ-মহাকাব্যের টেলেমাকাস; প্রতীকের অন্তরালে দুজনে পিতাপুত্রের শাশ্বত সন্ধানে নিরত। "ফিনেগানস্ ওয়েক"-এ ইয়ারুইকার কি শুধুই একজন সরাইওয়ালা? সে তো আসলে মানববংশের আদিপিতা, একটি সর্বজনীন চরিত্র। তার পুরো নাম

হাম্ফ্রে চিম্পডেন ইয়ারউইকার। নামটির আদ্যাক্ষরগুলো নিয়ে এ-বইয়ের মর্মকথা ঃ "হিয়ার কামস্ এভরিবডি"। জয়স প্রথম জীবনে "একজাইলস" নাটক লিখেছিলেন যার মননজীবী নায়ক এতই জটিল ও দূরের মানুষ যে তার স্ত্রী বার্থারও স্বামীকে মনে হতো অচেনা আগন্তুক। আব শেষ জীবনে এসে তিনি ইয়ারউইকারের মতো চবিত্র আঁকলেন। দু' জীবনে আঁকা এই দুটি চরিত্র জয়সের মানসিক বিবর্তনেব সুস্পষ্ট দিকনির্দেশ করছে। এবং এভাবেই তাঁর চরিত্রগুলো আস্তে আস্তে তাদের ব্যক্তিস্বরূপকে উন্মোচন করেছে, এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই আমরা প্রাগৈতিহাসিক দিন হতে আজকের দিন পর্যন্ত মানবেতিহাসের গোলকধাঁধা পার হয়ে আসি। স্বভাবতই এই অনুজু ইতিহাসের অন্তর্গত হবে নরনারীর প্রেম, জনক-জাতকের সন্ধান ও সংঘাত, মানবের মহিমা ও স্খলন, পাপ ও অনুতাপ, মৃত্যু ও পুনরুজ্জীবন এবং জীবনেব তাবৎ মৌলিক তথ্য ও সত্য। অতিশয় সংকীর্ণ দেশ ও কাল থেকে জয়স তাঁর চরিত্রগুলোকে সংগ্রহ করেছেন বটে, কিন্তু ইতিহাসের বিশাল পটে তাদের স্থাপন করেছেন এমনভাবে যাতে তারা অনেকান্ত তাৎপর্যে বিচিত্র হয়ে উঠেছে। সমসাময়িক রঙ্গমঞ্চে তারা যে-চরিত্রটির ভূমিকায় অবতীর্ণ সেই চরিত্রই ইতিহাসে চিরন্তন, বিংশ শতাব্দীর ডাবলিন-জনতা সমগ্র মানবেতিহাসের বিশ্ব-জনতা; যেহেতু ইতিহাস শুধু চক্রাবর্তন তাই তা "ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন"; আর এই সামগ্রিক দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে ঃ যেমন অতীতে যা নিহিত তা বর্তমানে জীবন্ত তেমনই এর বিপরীতটাও সমান সত্য। একদা এলিয়ট এক ভাষণে "ইউলিসিস" প্রসঙ্গে বলেন ঃ

"In some minds certain memories, both from reading and from life, become charged with emotional significance. All these are used, so that intensity is gained at the expense of clarity. In fact when Joyce evokes the past his sole purpose is to illuminate the present."

বর্তমান তাঁকে উদ্বাস্তু করেছিল বলেই জয়সের সমগ্র মনোযোগ ন্যস্ত হয়েছিল ইতিহাসের তথা কালধারার স্বরূপ সন্ধানে।

বর্তমানকে সমৃদ্ধ করে তোলার উদ্দেশ্যে এ-জাতীয় সন্ধানকার্যের পদ্ধতি প্রথাসিদ্ধ পন্থা হতে স্বতন্ত্র হতে বাধ্য। পন্থার দিশা জয়স পেয়েছিলেন কুড়ি বছর বয়সে একটি ফরাসী উপন্যাস পাঠে। বইটির প্রকাশকাল ১৮৮৭ খৃস্টাব্দ, লেখক এদোয়ার দুজারদাঁ। প্রথম পাঠেই জয়স হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বইটির বর্ণনাভঙ্গির অভিনবত্ব ও সম্ভাবনা। শুরু থেকে সারা পর্যন্ত পাঠকের যাত্রাবর্ত্ম নায়কের মনোরাজ্যের ভিতর দিয়ে, গল্পাংশ নিতান্তই সামান্য। "ইউলিসিস"-এর মতো বৃহদারণ্যক উপন্যাসের পেছনে দুজারদাঁর বইখানির

কোনও দূরতম অবদান থাকতে পারে একথা কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু কৃতজ্ঞতা-স্বীকারে জয়স ছিলেন অকৃপণ। উপন্যাস বিস্মৃত হলেও দূজারদাঁ তখনও জীবিত। জয়সের স্বীকৃতির ফলে অন্তত কিছুদিনের জন্যে তিনি প্রতিফলিত গৌরব ভোগ করেন এবং তাঁর বইটির পুনর্মুদ্রণও হয়।

দুজারদাঁর ক্ষেত্রে যা হলো, অর্থাৎ অন্তর্হিত তথা নির্বাপিত ঘটনার বর্তমানে প্রজ্জ্বালন, সেটাকেই শিল্প-সম্মত স্থায়ী ও সর্বাত্মক রূপ দেওয়ার পরীক্ষাকে জয়স সার্থক করেছেন। এলিয়েটের উদ্ধৃত উক্তি হতে এমন কথা ভাবা ভুল হবে যে অধীত ও জীবন থেকে আহৃত অভিজ্ঞতার স্তূপীকরণই জয়সের উদ্দেশ্য ছিল; পক্ষান্তরে ঐক্য ও ছন্দ সমতান ও সামঞ্জস্যই তাঁর অভিপ্রেত। জীবনকে অখণ্ড রূপে উপলব্ধি করলেই বোঝা যায় যে সব কিছুর সঙ্গেই সব কিছুর সম্পর্ক আছে। কোনও কিছুই অপ্রাসঙ্গিক নয়, অবান্তর নয়। সব চেয়ে অশোভন জিনিসটিবও এই অখণ্ডতার মধ্যে কোথাও না কোথাও স্থান আছে। এটা শুধু উপন্যাস রচনার কৌশলের প্রশ্ন নয়, এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে দার্শনিক তথা আধিবিদ্যক প্রতীতি। প্রকৃত প্রস্তাবে যে রচনা ঔইরূপ কোনও প্রতীতির দ্বারা প্রণোদিত নয় তা কখনো মহৎ সৃষ্টি হতে পারে না। ভার্জিনিয়া উলফের সঙ্গে জয়সের মুখ্য পার্থক্য এই নয় যে একজনেব রচনা চিত্রপ্রধান ও আর একজনের রচনা সুরপ্রধান। উভয়ের রচনা রীতিতে আপাত সাদৃশ্য বিস্তর এবং শ্রীমতী উলফ যদিও জয়সকে অপছন্দ কবতেন তবুও তাঁর "দি ওয়েভস" আর "বিটুইন দি অ্যাক্টস"-এর উপরে "ইউলিসিস"-এর প্রভাব সুস্পষ্ট। "দি ওয়েভস"-এ আমরা ছয়টি মনের ভাবনা-চিন্তার পুঙখানুপুঙখ বিবরণ ও বর্ণনা পাই বটে, কিন্তু এত বড়ো উপন্যাস হতে, গল্প দূরে থাক কোনও কাহিনীও খুঁজে বের করতে পাবিনে। তদুপরি উপন্যাসের চরিত্রগুলি এতই বৈশিষ্ট্যহীন, বলা যায় ব্যক্তিত্বহীন, যে পরিচ্ছেদের শীর্ষে জবানবন্দীদাতার নাম না উল্লেখ কবে দিলে কোন্‌টি কার জবানবন্দী তা বোঝাই দায় হতো। এ-বইয়ের লিপিচাতুর্য অবিস্মরণীয়, তা সত্ত্বেও এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে উপন্যাসটি রচনার আগে ও কালে শ্রীমতী উলফ গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অনিশ্চিত, এমন কি কখনও বা অচেতন, ছিলেন। তাঁর "বিটুইন দি অ্যাক্টস"-ও একই রকম উদ্দেশ্যহীন রচনা। আর এই উদ্দেশ্যহীনতার মূল হলো কোনরূপ প্রতীতির অভাব। পক্ষান্তরে জয়স তাঁর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন। যে-বর্ণনা, যে-চরিত্র, যে-বাক্য এবং যে-শব্দ সেই বিশেষ উদ্দেশ্যের সহায়ক নয় সে-সবের কোনও মূল্য নেই তাঁর কাছে। সর্বব্যাপী কালস্রোত ও বিশ্ববন্ধর ভাব-সত্ত্ব সম্বন্ধে জয়সের প্রতীতি বদ্ধমূল ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। আধুনিক জীবনের অসংখ্য খণ্ড ও ভগ্ন অংশ, কূট ও সূক্ষ্ম বিবরণ, বিরোধী চিত্র ও

বিবাদী সুরকে একত্র করে জয়স গড়ে তুলেছেন "ইউলিসিস"-এর এই আবশ্যিক অখণ্ডতা। আর এই নির্মিতির জন্যে তিনি যে-প্রক্রিয়া অবলম্বন করেছেন তা হলো চেতনাপ্রবাহের, ইয়ুঙের ভাষায় "দি রেসিয়াল আনকনশাস"-এর, সূত্র ধরে ব্যষ্টিগত স্বপ্ন থেকে সমষ্টিগত পুরাণে প্রয়াণ। আমাদের অতীত ও ভবিষ্যৎকে আবৃত করে যে-জীবন তা শুধু শিল্পের উপকরণ, তাকে ভেঙে চুরে মহৎ শিল্পী অন্য এক জীবন গড়ে তোলেন, তারই নাম শিল্প এবং যে-ভিত্তির উপরে শিল্প গড়ে ওঠে তা-ই শিল্পীর প্রতীতি।

অর্থাৎ তা হলো জীবনের প্রতি শিল্পীর এক বিশেষ বোধ যা তাঁর সত্তার সঙ্গে নিগূঢ়রূপে সম্পৃক্ত, সুসংবন্ধ, যার শক্তিতে শিল্পীর সমস্ত কীর্তি একটি ক্রমিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়। যেমন ইয়েটস অথবা ব্লেকের কবিতা। ইয়েটসের প্রথম দিকের রচনাবলী সুন্দর ও উজ্জ্বল, চিত্তগ্রাহী, কিন্তু প্রতিটির থেকে প্রতিটি বিচ্ছিন্ন। যতই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আত্মানুকর্ষণ করতে লাগলেন ও নিজেকে নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে বাঁধলেন ততই তাঁর কাব্যে একটা প্রত্যয় ফুটে উঠতে লাগল। এ-সময়ের কবিতাগুলিও স্বয়ংসম্পূর্ণ, অথচ স্পষ্ট বোঝা যায় যে একটি কবিতার থেকে আর একটি কবিতা অবিচ্ছিন্ন, সে-অবিচ্ছিন্নতা যেন একটিই সুরের বিস্তার। কবির ওই প্রত্যয় হয়তো অধিকাংশ পাঠকের কাছে গ্রাহ্য হবে না, কিন্তু শিল্পীর কাছে তা আলো হাওয়ার মতোই অকাট্য সত্য। প্রকৃতপক্ষে ওইরূপ একটি প্রত্যয় ছিল বলেই জয়সের সমগ্র সাহিত্যকীর্তিতে চোখে পড়ে অসাধারণ সামঞ্জস্য, একটি অপ্রতিম মৌল বিবর্তন।

"এ পোর্ট্রেট অব দি আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়ংম্যানের" সঙ্গে তার প্রথম খসড়া "স্টিফেন হিরো"র প্রতি তুলনাতেই ধরা পড়বে যে কেমন করে বাইরের অভিজ্ঞতা-গুলির যথাস্থিত বিবরণ ক্রমে ক্রমে রূপান্তরিত হলো বিভিন্ন পরিস্থিতিতে শিল্পীর মানসিক প্রক্রিয়ার একান্ত অন্তর্মুখী বর্ণনায়। উপন্যাসটির পরিণত রূপে প্রতীকতার প্রতি যে-প্রবণতা দেখা যায় তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে শৈশবের সঙ্গে জড়িত নানা ধর্মীয় প্রতীকের অবিরাম শিল্পগত মূল্যায়নে। গির্জার প্রাঙ্গণ থেকে শিল্পের মন্দিরে নায়কের উপনয়ন, এইটেই তো এ-উপন্যাসের কাহিনী। ফলে উপন্যাসটিতে পরীক্ষিত প্রকরণ যাথার্থ্য পেয়েছে বিষয়বস্তুর সঙ্গে ওতপ্রোত সাযুজ্যে। শুধু ধর্মীয় প্রতীকগুলি নয়, শৈশব ও বাল্যের কিছুই তিনি ভোলেননি এবং যাদের কাছ থেকে আঘাত পেয়েছিলেন তাদের কাউকে তিনি মার্জনা করেননি। তাদের অনেককে তো প্রকৃত নামে উল্লেখ করে তীব্র সমালোচনা ও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করেছেন। বাড়ির প্রতিকূল আবহাওয়া, বিদ্যালয়ের উদাসীনতা ও অত্যাচার, বিশ্ববিদ্যালয়ের পল্লবগ্রাহিতা ও স্থূলতা —এই সব মিলে নায়ককে জীবনবিমুখ, নৈঃসঙ্গ-অভিলাষী ও দাম্ভিক করেছে।

তাই স্টিফেন আপনাকে যুক্ত করেছে শিল্পীর মনোজগতের সহিত। সে বুঝেছে যে এই রিক্ত জগৎ পরিত্যাগ করে তাকে নতুন জগৎ গড়তে হবে। শিল্পই তো সেই নতুন জগৎ। স্টিফেন তার বয়ঃসন্ধির রণধ্বনি তুলেছে।

"His soul had arisen from the grave of boyhood, spurning her grave-clothes. Yes. Yes. Yes. He would create proudly out of the freedom and power of his soul, as the great artificer whose name he bore, a living thing new and soaring and beautiful, impalpable, imperishable."

এবং পুনরায় সমুদ্রের ধারে একটি মেয়েকে দেখে স্টিফেনের মনে হয় ওই মেয়েটি তার উল্লাস ও উত্তরণের প্রতীক ঃ

"Heavenly God, cried Stephen's soul, in an outburst of profane joy..Her image had passed into his soul for ever and no word had broken the holy silence of his ecstasy. Her eyes had called him and his soul had leaped at the call. To live, to err, to fall, to triumph, to recreate life out of life. A wild angel had appeared to him, the angel of mortal youth and beauty, an envoy from fair courts of life, to throw open before him in an instant of ecstasy the gates of all the ways of error and glory. On and on and on and on."

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাব জগতের বিরুদ্ধে জয়সের যুদ্ধ "ইউলিসিস"-এ আরও এগিয়েছে। শৈশব ও বাল্যের জগৎ ছিল অগভীর ও সংকীর্ণ, পরিণত বয়সের সমস্তই এখন বহুগুণে প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে অর্থাৎ জয়সের যেটা প্রাথমিক উপলব্ধি কালস্রোতে তাব কোনও গুণগত পরিবর্তন হয় না, যা হয় তা সম্পূর্ণ পরিমাণগত, যা শিথিল ছিল তা-ই এখন হাড়ে মজ্জায় সঞ্চারিত হয়ে বদ্ধমূল। স্টিফেনের ডাবলিন পরিত্যাগ বৃহত্তব বর্জনশীলতার পরিচায়ক—ওই নগরের বিশ্বাসহীন ধর্মাচবণ, সত্যাচ্ছিন্ন সংস্কার, সহানুভূতিহীন সমাজ, ভাগ্যহীন জীবনধারা--ওই নগর বিংশ শতাব্দীর বিশ্বের কুঞ্চিকা। মানুষ যে একাকী ও পরিত্যক্ত এই উপলব্ধি তার সমগ্র জীবনচর্যায় কখনও প্রচ্ছন্ন কখনও প্রকট রূপে সর্বদা প্রবাহিত। তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সে নিজেই ঘোষণা করেছে ঃ

"The artist, like the God of the creation, remains within or behind or beyond or above his handiwork, irresponsible, refined out of existence, indifferent."

শিল্পের মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে পেছনের পৃথিবীকে অস্বীকার করতে চেয়েছে স্টিফেন। সর্বপ্রকার অস্বীকারের সে প্রতিমূর্তি।

পক্ষান্তরে লিয়োপোল্ড হলো "এ ওয়ার্কিং অ্যান্টিথীসিস" আধুনিক জীবনের অর্থহীনতার অব্যর্থ অভিব্যক্তি। সে যেমন স্থূল তেমনই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ। জন্তু ও পাখির দেহাভ্যন্তরের যন্ত্রাদি সম্বন্ধে তার রসনাপ্রীতির প্রসঙ্গ দিয়ে পাঠকের সঙ্গে উপন্যাসে তার প্রথম পরিচয়; তার প্রিয় খাদ্য বিশেষ ভাবে রন্ধিত গন্ডল-বৃক্ক, তার আনন্দ মলত্যাগে। "ইউলিসিস"-এর বৃহত্তর অংশ ডাবলিনে শ্রীযুক্ত ব্লুমের যে কোনও একটি দিনযাপনের সবিস্তর বিবরণঃ একলেস স্ট্রিটের বাড়িতে সকাল সাতটায় প্রাতঃরাশ, প্যাডি ডিগনামের শবযাত্রায় যোগদান, দৈনিক পত্রিকার দপ্তরে গ্রন্থাগারে শহরের পথে পথে যাওয়া-আসা, গার্টি ম্যাক ডুয়েলের সঙ্গে অভিনয়, প্রসূতি সদনে হাজিরা, ডেডালাসের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, বেলা কোহেনের প্রমোদাবাসে উভয়ের অভিযান। সারাদিনের জন্যে তার সঙ্গী হয়ে পাঠকের মনে জাগে অশেষ বিরক্তি; এবং বারবার তার মনে এ-প্রশ্নই ওঠে যে লোকটার উদ্দেশ্য কী, কেন সে এভাবে ঘুরছে, এমন একটা লোকের বেঁচে থাকার কী সার্থকতা, পৃথিবীতে তার মূল্য কোনখানে। পাঠকের মনে একবার অমন প্রশ্ন জাগাতে পারলেই লেখকের লক্ষ্যভেদ। কারণ তিনি জানেন যে ওই প্রশ্ন কোন-না-কোন সময়ে গতি পরিবর্তন করে পাঠকের আত্মাভিমুখী হবে। দৈনন্দিনকার জীবনযাত্রায় আমাদের চেতনার চারপাশে অভ্যাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের যে কঠিন আবরণ গড়ে ওঠে তার মধ্যে ওই প্রশ্নের দুর্মর কীট প্রবেশ করিয়ে দেওয়াই জয়সের উদ্দেশ্য।

স্টিফেন ও লিয়োপোল্ড পরস্পরের পরিপূরক। একজন শিল্পী হিসেবে নির্বাসিত, অপরজন ইহুদী হিসেবে। লিয়োপোল্ডের মন অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ও স্বচ্ছ দর্পণ যার মধ্যে তাদের দুজনকে ঘিরে আবর্তমান বিশ্ব প্রতিফলিত, যার মধ্যে ডাবলিন শহরটা বিবিধ চিত্রকল্পে মূর্ত; সে যেমন আশুচেতন তেমনই ঘটনার যথাযথ রূপ গ্রহণে ও সংগ্রহে সারাক্ষণ ব্যাপৃত। পক্ষান্তরে ডেডলাস সর্বদা বাস্তবকে পরিহার করে দূরকল্পনা ও আত্মানুধ্যানে মগ্ন। তার মধ্যে ব্লুম পেয়েছে আপন মৃত পুত্র রুডিকে, যার জন্যে একটা গোপন কাঁটা সারাদিন থেকে থেকে খোঁচা দিয়েছিল। একজন পোড়-খাওয়া বাস্তববাদী স্নেহ-পরায়ণ পিতা, অপরজন স্পর্শকাতর ভাবপ্রবণ পুত্র। উপন্যাসের শেষে লিয়োপোল্ড অভিমানে ক্ষুব্ধ স্টিফেনকে শান্ত করতে করতে বাড়ির পথে পা বাড়ায়। কিন্তু সত্যি সত্যি কি তাদের পথ এক হতে পারে? তখন অনেক অনেক রাত, দুজন দুটি পথ ধরে এগিয়ে যায়। কাহিনীর শেষ নয়, দিনের শেষ। এই রাতও ভোর হবে, দিনের পরে দিন আসবে, সূর্য উঠবে, জীবন-

স্রোত বয়ে চলবে অলক্ষ্য অন্তহীনতায়। এ-কাহিনীর শেষ কোথায়! অশেষ কাহিনীর একটি কণা "ইউলিসিস"। অকূল সিন্ধু বন্দী হয়েছে একটি বিন্দুতে। এ-উপন্যাসের শেষ সিদ্ধান্ত হলো এই যে শারীরিক অর্থেও স্টিফেন থাকবে নির্বাসনে আর লিওপোল্ড ডাবলিনে। স্টিফেন তো নির্বাসনেই ছিল।, অর্ধাশনে জর্জরিত তার ছ মাসের প্যারিস-জীবনে ছেদ এনে দিল একটি টেলিগ্রাম, "মাদার ডাইং কাম হোম ফাদার" ডাবলিনে ফিরে এল স্টিফেন। কিন্তু ক্যাথলিকতাব বিরুদ্ধে তার আপত্তি এত প্রবল যে মুমূর্ষু মা যখন তাকে প্রার্থনা করতে মিনতি করলেন তখনও সে তা রাখতে পাবল না। তারপরে এল অনুশোচনা, তার প্রতিটি মুহূর্তকে তাড়া কবে ফিরতে লাগল বিভীষিকা হয়েঃ

"Silently, in a dream she had come to him after death, her wasted body within its loose brown grave clothes giving off an odour of wax and rosewood, a faint odour of wetted ashes"

আজ সারাদিন একটা অপবাধবোধ তাকে কুড়ে কুড়ে খেয়েছে, ডাবলিনের কোনও কোণেই সে অব্যাহতি পায়নি সেই বোধটার ধাবালো কামড় থেকে। যে প্রার্থনা সেদিন তাব গলায় আটকে গেছল তা-ই আজ ফিবে ফিরে মনে আসছে।

"Her hoarse loud breath rattling in horror, while all prayed on their knees. Her eyes on me to strike me down. Liliata rutilantium te confessorum turma circumdet : inbilantium te virginum chorus excipiat."

লিওপোল্ড জৈব-অস্তিত্বসর্বস্ব বলে যে তাব মস্তিষ্ক নিষ্ক্রিয় ছিল এমন কথা ভাবা ভুল, সে শুধু বুদ্ধিমান নয়, চতুরও বটে। এবং তার মধ্যে যে একটা "টাচ অব দি আর্টিস্ট" আছে এ-কথাটা উপন্যাসেব অন্তত একটি চরিত্র বলেছে সে লেনেহান, অন্তত একটি চরিত্র সে-কথা মেনেছে, সে ম্যাকয। শিল্পী হিসেবে তাব যতটা হতাশা ছিল স্টিফেনেব প্রতি তাকে আকৃষ্ট করার পক্ষে তা যথেষ্ট। পক্ষান্তরে স্টিফেনেরও এমন অনেক নৈরাশ্য ছিল ব্লুমের সংস্পর্শে যাব নিবৃত্তি। একজনের যেটা অভাব সেটাই অপরজনের স্বভাব। একজনকে বাদ দিলে অপবজন অপূর্ণ। ডেডলাস বিশ্লেষণী চিত্তবৃত্তি দিয়ে আর ব্লুম ঐহিকতার চূড়ান্ত নিদর্শন দিয়ে সংস্কৃতি ও অসংস্কৃতির, হেলেনিজম ও হিব্রুইজমের বিভেদ নির্দেশ করেছে। মধ্যবিত্ত জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝা একজনকে করেছে অবিচ্ছিন্ন, অপরজনকে আশালীন, একজনকে অন্তর্মুখী, অপরজনকে বহির্মুখী। একজন চিৎপ্রকর্ষের, অপরজন স্থূল জৈব অস্তিত্বের প্রতিমূর্তি। এই দুটি বিপরীত চরিত্র কোনও সুসমঞ্জস ঐক্যতান সৃষ্টি করতে অক্ষম।

অথচ "ইউলিসিস" সত্যিই একটি অনন্য ঐকতান। আর তা সৃষ্টি করা জয়সের পক্ষে সম্ভব হয়েছে মলি ব্লুমকে এনে। সব শেষে তাকে আনা হয়েছে, কিন্তু উপন্যাসে সে মোটেই প্রক্ষিপ্ত নয়। মলিই জয়সের বিশ্বের মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকেন্দ্র। পুরুষের অভীপ্সায় ও পারস্পরিক বৈপরীত্যে বোনা জীবন একটা অচ্ছেদ্য জাল যার মধ্য দিয়ে মলির দীর্ঘ নৈশ রোমন্থনপরায়ণ ছেদযতিহীন স্তব্ধ ভাষণ আবহমান কাল ধরে প্রবাহিত। নারীর ঋতুচক্র-সদৃশ স্বতঃস্ফূর্ত অনুষঙ্গে তার অবাধ চিন্তার স্তরগুলি পরম্পরাক্রমে উন্মোচিত হয়েছে। দান্তে বা গ্যেটের নায়িকার মতো সরাসরি ভাবে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের নয়, মলি এই অপলাপী বন্ধ্য নির্গুণ যুগে কেন্দ্রাসীনা ধরিত্রীর উর্বরাশক্তির প্রতীক। তার কোনও ক্রিয়া নেই, কারণ তার মধ্যে সকল বিরোধ ও বিবাদ অবসিত। অপ্রতিবোধ্য সদর্থকতায় তার স্বগতোক্তির পরিসমাপ্তি ঃ

"and then I asked him with my eyes to ask again yes and then he asked me would I yes to say yes my mountain flower and first I put my arms around him yes and drew him down to me so he could feal my breasts all perfume yes and his heart was going like mad and yes I said yes I will Yes."

মলির এই উক্তিতে অস্তিত্ব ও সৃষ্টির প্রতি যে-বিশ্বাস অভিব্যক্ত হয়েছে তা যোগীসাধকদের গূঢ়তম অধ্যাত্ম অনুভূতিরই শামিল।

স্টিফেন ডেডলাস যদি স্বপ্নজগতের আর লিয়োপোল্ড ব্লুম বাস্তবজগতের মানুষ হয়ে থাকে, তবে মলি ব্লুম উভয়ের মধ্যেকার সেতু। জয়স বিশ্বাস করতেন যে স্রষ্টা বা শিল্পীর কাজ এই দুই বিপরীত জগতের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা ও দূতীগিরি করা। ত্রিয়েস্তে একবার তাঁকে আহ্বান জানানো হয়েছিল যে কোন দুজন ইংরেজ লেখকের উপরে বক্তৃতা করার জন্যে। তিনি ডানিয়েল ডিফো ও উইলিয়ম ব্লেককে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর বক্তৃতার বিষয় হিসেবে। এই নির্বাচনের কারণ কী? প্রথমজন যেমন বাস্তবানুগ শেষোক্তজন তেমনই কল্পনা-ও-অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন। জয়সের সাহিত্যিক বিবর্তনও এই ধারা অনুসরণ করেছে। বিবর্তনের এক প্রান্তে রয়েছে "এ পোর্ট্রেট অব অ্যান আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়ংম্যান", অপর প্রান্তে অবস্থিত "ফিনেগানস ওয়েক" একটি যথাস্থিতবাদের পরাকাষ্ঠা, অপরটি প্রতীকবাদের। "ইউলিসিস" দুটি প্রান্তের সেতুবন্ধন। জয়স যখন "ইউলিসিস" রচনা শুরু করলেন তখন তাঁর সামনে হোমরের "অডিসি"-র মতো দান্তের "ডিভাইন কমেডি"-ও ছিল আদর্শ রূপে। "ইউলিসিস" ও "ফিনেগানস ওয়েক" হলো তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে 'ইনফার্নো' ও 'পারগেতোরিয়ো'। কিন্তু 'প্যারাডাইসো'-র খসড়া করাই সার হলো,

তা লেখার আগেই এল যে-স্বর্গ তিনি তৈরি করতে চেয়েছিলেন সেখানের ডাক। তবে দান্তের মহাকাব্যের সঙ্গে জয়সের পরিকল্পনার যে সাযুজ্য তারও সীমা আছে। স্ব স্ব তাৎপর্যে "ইউলিসিস" ও "ফিনেগানস ওয়েক" দুখানিই কমেডি। টীকা-টিপ্পনির খাতায় জয়স স্বয়ং লিখেছিলেন,

"Tragedy is the imperfect manner and comedy the perfect manner in art."

সুখী পরিণাম নয়, এখানে কমেডির অর্থ অখণ্ডতা। জয়সের উপন্যাস জীবনের সমস্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলোকে একত্র করে শিল্পসিদ্ধ এক অখণ্ড রূপ দিয়েছে।

(ক্রমশ)

## কবিতাবলী । কবির ভাষ্য

### চিত্ত ঘোষ

কথা সাজিয়ে কবিতার কতখানি ব্যক্ত করা যায় জানি না। অভ্যাসবশত যা লিখি বা ভিন্ন কারণে লিখতে সচেষ্ট হই, স্পষ্ট না হ'ক, বা যত অস্পষ্টই হ'ক, তার একটি আকার মানসে থাকে। কুণ্ঠায় সে আকার যেন প্রায় নারী-স্বভাব। অথচ তার অভাবনীয় মায়া।

কবিতা হয়তো বা অনুভবের অভিন্ন উক্তি। উপলব্ধির নিকটতম কথা। কথার সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ অসামান্য রূপ। শব্দ কবিতার শক্তি এবং সময় পটভূমি। জীবন আস্বাদ এবং কোন মৃত্যুই শেষ নয়। কবিতা রচনা বহুবিধ অর্জন এবং আয়ত্তের অনুগামী বলে মনে হয়। মনে হয় সেই বিদীর্ণ মানস সত্তার আশ্রয়ে স্থিত হলে শুদ্ধ সীমা সমীপবর্তী হতে পারে।

পৃথিবীর আদি কবিতার অশেষ আরম্ভ এবং তদবধি বিপুল উজ্জ্বল অফুরন্ত প্রবাহকল্প আমি সর্বক্ষণ স্মরণে রাখতে চাই।

### আমরা দেখেছিলাম

আকাশে চোখ আর চন্দনার সাঁতার
রোদের রঙ গাছের গা বেয়ে নামে
কোনো ভোর জারুলের ডালে দাঁড়িয়ে দেখে
মেঘের হাত কলস উপুড় করে।
খুশি শিকড়গুলো আস্তে আস্তে ঠোঁট মেলে
নানা কোমলতা ভিজে ওঠে।
হাওয়ায় মৌ মৌ করে বউলের গন্ধ
বিচিত্র ফড়িঙ উড়ে বেড়ায়
অনেক মৌমাছি চাক বাঁধে
মৌলিরা চাক ভাঙে, আগুন জেলে পোড়ায়
দশহাতে মধু লুট করে।

আর রাত্তিরে মোম জ্বালাবার জন্য
অন্ধকার ঘন হয়ে ওঠে।
সেই রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে
হারিয়ে যায় চোখ আর চন্দনার সাঁতার
যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা এসব দেখেছিলাম
সেখানে একটা নিশান পুঁতি।

## একদিন ডাকবে

আমাদের গায়ের কেটে-বসা কয়েকটা দাগ
আর কিছুতে মোছে না।
বাতাহত সময়ের চিহ্ন সেগুলো।
মৌলিক মুহূর্ত অনাবৃত হলে
বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটার শব্দ শোনা যায়
কোনো দৃশ্য আলোড়নের মত ফাটে
কোনো দিন প্রতিবিম্বের মত কাঁপে
কোন ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে মিলায়।
আকাশের রঙ ধুয়ে ধুয়ে এখন সাদা
অনেক মেঘ সাঁতরে সাঁতরে সূর্যকে ছোঁবে
ব্যাপ্ত ধ্বনিপুঞ্জ নড়ে ওঠে
দূর বিন্দুর কাছে গিয়ে শুনব
আহত অশ্রুধ্বনিময়তা।
রাত্রি যেন তারা ধরাব কৌশলী জাল ;
সেই জালে বন্দী চোখের চাউনি
ভিজিয়ে দেবে আমার ঘুম
আর সে ঘুমের জানালায় দাঁড়িয়ে
একদিন আমার নাম ধরে ডাকবে রোদ্দুর।

## প্রবেশদ্বারের কাছে

প্রবেশদ্বারের দিকে দৃষ্টি পথ ঃ
প্রাচীরে দুর্যোগ দুঃখ রচিত সময়
দৃষ্টির সম্মুখে যেন পরভোগ্যা প্রেমিকা আমার।

যাবো বলি—
ফেলে যাবো ভগ্ন এই প্রতারিত অশুচি উদ্ধার
শিকড়ের মুখে চির অশ্রুপাত
সিক্তনাভি গাছে ফুল, পতঙ্গের সমন্বিত শোক।

ফিরে আসি নদীর উঠোনে, গন্ধে, জলে
ফিবে আসি বৃক্ষতলে, ছায়ার ভিতব
ক্রমশ স্নায়ুব স্রোত বারি
ধৌত কবে পাহাড়েব কঠিন উচ্চতা

প্রান্তসীমাতটে কার মুখ!
উপরিভাগেব দিকে বিপুল বল্লরী শোভা
দূষিত বলয় পৃষ্ঠে অগণিত পাখি।
মুখশ্রী, হৃদয়, অশ্রু, স্বর
প্রবেশদ্বারের দিকে টানেঃ
দুটি ভগ্ন প্রতিমূর্তি কারা
প্রবেশদ্বারের কাছে থাকে।

## যে দিকে

দিনগুলো ফেরাই কোনদিকে
কোনমুখো বিরলভূমি, পথ!
পা মুড়ে বসতে চায় ছায়া
নিবে আসে নিকটের প্রতিধ্বনি, মুখ।

নদীর শিরায় টান, ছিন্নতা প্রবল
শালিখের গর্ত চোখ, বিলীনতা বায়ু
দিনগুলো পা ডোবায় জলে
ভেসে যায় সারি সারি নৌকোর একতা।

যে সব গাছের বুক ছায়া দিল, তারা
যে সব ফলের স্বাদ স্মরণীয়, তারা

যে সব হৃদয় দূর স্মৃতি শব্দ, তারা
দিনগুলোকে ঘিরে রাখে যেন।

এই জলে ধুয়ে ফেলো ধুলো
ভালবাসা ভরুক কলস।
যেন শিশুবৃক্ষ পায় জল
যেন জলে প্রিয় এক প্রতিবিম্ব থাকে।

যে দিকে ফেরাই যেন হৃদয়ের মুখ
স্পর্শ করে কোমলতা, আহত কঠিন।
যেন ভেজা মাঠ থেকে টলটলে হাওয়ায়
দিনগুলো দিঘির মত ছায়া ধরে বুকে।

## কবিতাবলী । কবির ভাষ্য

### আলোক সরকার

প্রথম জন্মদিন অলৌকিক অজানা। প্রথম জন্মভূমি, তার আকাশ, তার সমগ্রতার সচ্ছল আলোক—তারই অন্বেষণে আমার অভিযাত্রা। প্রথম জন্মদিন, তার গভীরতম অপ্রাপ্তি, শিকড়হীনতার যন্ত্রণা প্রতিটি রহস্যের চূড়ায় সংহত নির্দেশ। এই শিকড়হীনতা, এই রহস্য কবিতার অনন্য পটভূমি। তন্ময় অন্তরালে একদিন হিরণ্ময় প্রস্তুতি, একদিন বিকীর্ণ সমারোহ, নিশ্চিত সংযুক্তি অথচ সেই আত্মীয়তা নির্মোহ অস্বীকার। সমস্ত জীবন মনে হয় অনিকেত, উদ্বাস্তু, সেইখানে এমনকি প্রেমিকাও অসম্পূর্ণ ভয়াবহ অন্ধকার, রৌদ্রদীপ্ত দিন অবরুদ্ধ অবগুণ্ঠনের গাঢ়তম আন্তরিকতার মুহূর্তে প্রখরতম অশ্রুর নিনাদ। এই অন্ধকার, এই অবরোধ, এই প্রখরতম অশ্রু নিনাদ আমার কবিতায় অন্তর্লীন একাকীত্ব, কবিতায় যে মৌলিক দ্বিতীয় বিশ্ব রচনার প্রয়াস তার ভিতর সেই বাস্তব অভাবনীয়ের প্রতিষ্ঠা আকাঙ্ক্ষা করি।

### জন্ম

যা কিছু স্থবির তাই মৃত। জীবন অর্থই
গতিময় বিদ্যুতি রেখার দ্যুতি। গোধূলিবেলার মেঘ
দিকে দিকে সম্পূর্ণ অথচ ম্লান দিঘির অর্থই
নিয়ে অবারিত করে অসীম নিস্পৃহ। একদিন সকালবেলায়
একটি বকুল তুলেছিলে অভিমান নিরুদ্ধ আবেগ।
আজ কোনো অভিযোগ নেই, অভিমান নেই, আর্ত অস্বীকৃতি
আনে না দ্বিতীয় চিত্র রৌদ্রময়, প্রতিবাদী প্রতিষ্ঠ স্পর্ধায়।

কেবল একটি স্থির শ্বেতপদ্ম সারাদিবসের দীর্ঘ স্মৃতি
নিয়ে উচ্চারিত। আর পশ্চিম আকাশে
হাজার রঙের মেঘ নিভে গেলে অন্ধকার নিস্পন্দ নির্বাক।

যেন স্বাভাবিক, যেন প্রত্যাশার ছিলো, যেন নীরব বিশ্বাসে
এই অন্ধকার কাছে চেয়েছিলে। দুপুরবেলার সেই
বাগান কি মনে আছে? সারাদিন বিক্ষত ঘোষণা, তীব্র তীক্ষ্ম ডাক।
অন্ধকারে কোনো প্রতিচ্ছবি নেই, এমন কি প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

শুধু শ্বেতপদ্ম জ্বলে স্বাভাবিক, সম্পূর্ণ গৌরব। দুপুরবেলার
বাগানে গোলাপ ছিলো, কৃষ্ণচূড়া ছিলো, তার মাঝে
শ্বেতপদ্ম খণ্ডিত প্রকাশ। বন্ধুহীন সান্দ্র অন্ধকার
শ্বেতপদ্মের পাশে কিছুই রাখে না। অন্ধকার তাই
ভালোবাসো? অন্ধকার কেবল একটি উচ্চারণ, সেইখানে তন্ময় উদ্ভাসে
নিজেকে সংহত করে শ্বেতপদ্ম। মৃত্যুর অদৃশ্য রোশনাই
দিকে-দিকে অমোঘ গোপন জাগে স্থবির নিস্পৃহ অস্বীকারে।

স্থবিরতা কখনোই ভালো নয়। কিন্তু কোন শান্ত ব্যবহারে
স্থবিরতা মৃত্যুকে নিঃশেষ মোছে। গতিময় সংহত আঁধার
যেন মৌন নিশীথিনী পার হয় তিমির ভুবন।
সহসা নদীর রেখা চোখে পড়ে, আম্রকুঞ্জতলে
একটি খড়ের বাড়ি দরজা-জানলা খোলা, নম্র উপচার
দ্বিতীয় প্রেমিকা শুভ্র হাতে আনে। স্থির শ্বেতপদ্ম রাখো
স্বাগত দু-হাতে আর মিলনমুহূর্তে জ্বলে আদিগন্ত অকম্প নির্জন।

## ছবি

সকল ছবিই গাঢ় অনুষঙ্গ আনে। মাঝে-মাঝে
দু-একটি ইঙ্গিত শুধু ধ্বনিময়। কিন্তু মাঝে-মাঝে
কোথাও সংযোগ নেই, কেবল রহস্য এক অকথিত সাজে
নিয়ে যায় বিজন পথের শেষে। তখন সমস্তবেলা
অত্যন্ত আগ্রহ আর নিঃস্ব অনিকেত অনুভব।

কোথাও নিশ্চিত আছে পরিচিতি। যেখানেই অতন্দ্র নীরব
সেখানেই খোঁজ করি। সব নীরবতা জেগে থাকে।
রাত্রির বাগানে ফুল জেগে থাকে এক ছায়ালীন পরিচিতি

বুকে নিয়ে, সন্ধ্যার আকাশে মেঘ, সহসার বাঁকে
সেই দেবদারু। মনে হয় দীর্ঘ অন্তরাল
সকল ছবির মধ্যে জেগে আছে—ধ্বনিময় প্রসন্ন সম্প্রীতি
বিরাট কপাট খোলে বারবার, মেলে দেয় স্বাগত সকাল।

কিন্তু কোনখানে সেতু, মিলনী সংবাগ? গ্রহণ করার প্রয়োজনে
স্বচ্ছ উন্মোচন চাই। সব ছবি
সুদূর অপরিচয়। শুধু মাঝে-মাঝে সঘন নির্জনে
হাজার হীবার দ্যুতি অশ্রুময়, নিয়ে যায় আলো-অন্ধকার
বনের ভিতরে। সেইখানে পদচিহ্নহীন মাটি, সেইখানে মৌলিক দিঘির
পাশ দিয়ে কখনো হরিণ চলে যায়, কখনো বা তামসী ছায়ার
ভিতরে বিদ্যুতি গাঢ় আবির্ভাব। এইসব অস্ফুট স্মৃতির
গুঞ্জনে আকাশ আরো নিশীথিনী, সব ছবি উদ্‌গ্রীব আঁধার।

## মুহূর্ত

সেইদিন আমার পড়ে না মনে যেদিন তোমার
স্মৃতি থেকে আমি মুক্ত। সে কোনো আনন্দ নয়, দুঃখ নয়, যেমন মলিন
পাতা ঝরে যায় কিম্বা সন্ধ্যা নামে ম্লান অন্ধকার
তেমন সহজ সেই ভুলে-যাওয়া। ঘটনাবিহীন
মুহূর্তকে কেবা মনে রাখে, যে-মুহূর্ত কোথাও রাখে না কোনো ছবি।
শব্দহীন চিত্রহীন মুছে গেল আমাদের প্রেম। তবু কোনখানে
বিশ্বাস করতে যেন ভয় হয়। মনে হয় চারিদিকে সবই
নিরাসক্ত কঠোর শীতল নিয়ে উপেক্ষায় তীক্ষ্ণ শ্লেষ হানে—
এতো বড়ো দুঃখ তাকে এমন সহজে ভুলে-যাওয়া।

এখন যে রমণীকে ভালোবাসি, শ্যামলিম দীর্ঘ শান্ত ছায়া
নিয়ে যে রমণী আছে কাছাকাছি, দু-বছর আগে
তার নাম আমার অপরিচিত ছিলো। কী করে কখন সব এক হয়ে যায়
মিলিত উত্তাপে কাঁপে বসুন্ধরা, স্বাভাবিক বক্ত অভিভাবে
আমার রমণী আর আমি শুধু। তবু কোনখানে
বিশ্বাস করতে যেন ভয় হয়। মনে হয় ক্রূর হিংস্র হাওয়া

হঠাৎ বাঁ পাশ দিয়ে চলে গেলো। সর্পিল ধূসর হতমানে
আহত আক্ষেপ যেন বটগাছ। মুহূর্তে হয়েছে ছবি কিন্তু কোন
নিঃস্ব ধারাজলে
সকলই অস্পষ্ট যেন বিকেলবেলার মেঘ, সমারোহ নিঃসীম মিলায়॥

মুহূর্তকে ছবির মাধ্যমে মনে রাখি। কিন্তু কোন নিষ্প্রাণ প্রখর
চিত্রহীন অসংখ্য মুহূর্ত এসে সব ছবি মুছে দিয়ে যায়।
বোঝাই যায় না কিছু! পরিচিত প্রীতিগুলি, দু-জনার বিস্তীর্ণ প্রহর
চারিদিকে দ্যুতিময় বিচিত্র আকাশ জেবলে উভয়ের একটি রক্তিম
আজ তার স্মরণেও ভ্রান্তি আসে। ঘটনাও নিঃশেষ হারায়
ঘটনাবিহীন নিঃস্ব মুহূর্তের হাতে। সব ধ্বনি, শব্দ, আয়োজন
বিশ্বাস করতে যেন ভয় হয়। মনে হয় দিগন্ত অসীম
একটি মেঘের ভীত জ্বলে-ওঠা, নিভে-যাওয়া, অবিশ্রান্ত ধুলো-ওড়া দূরে
দেখায় তামসী গাঢ় অন্তরাল, চিত্রহীন প্রবাহিত গহন নির্জন।

# অস্তগত সবিতার উত্তরাধিকার

অমিতাভ দাশগুপ্ত

অতএব মিখাএল এঞ্জেলোকে লাশকাটা ঘরে যেতে হয়েছিল। কারণ তিনি নাকি জীবনে দেবদূত দেখেন নি, তাই জানতেন না দেবদূত কি করে আঁকতে হয়। আরো মুস্কিলে পড়েছিলেন দেবদূতের ডানাজোড়া নিয়ে। ডানা দুটো কি উল, সিল্ক না হাড়-মাংস জাতীয় কিছু দিয়ে তৈরী, কেউ তার হদিশ দিতে পারেনি। আর সবচেয়ে বেশী গন্ডগোল বাঁধিয়েছিল দেবদূতের মাথার পেছনে জ্যোতিঃপুঞ্জ গোছের একটা গোলমেলে ব্যাপার। ওটা কি কোন শক্ত ধাতু দিয়ে তৈরী বা রামধনু ধাঁচের একটা বাতাসী ব্যাপার, মিখাএল বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তাই তাঁকে লাশকাটা ঘরে যেতে হয়েছিল।

দরজাটা বন্ধ করতেই মিখাএল অনুভব করলেন এই প্রথম তিনি আর মৃত্যু মুখোমুখী। মেরুদাঁড়ার ব্যারোমিটার দিয়ে ভয় কাঠবেড়ালীর মত ওঠানামা করতে লাগল। ওই পাথুরে টেবলটার ওপর ঢাকনার আড়ালে কে মরে হিম হয়ে আছে ?

এসব কি ভাবছ মিখাএল। তোমাকে মাত্র তিনঘণ্টা সময় দেয়া হয়েছে। ছুরীকাঁচিগুলো ঝোলা থেকে বের কর। মরাই হোক আর জ্যান্তোই হোক, শরীরটা তো ঠিক একই জিনিস দিযে তৈরী। আত্মা-টাত্মা নিয়ে তোমার কারবার নয়। মোমবাতিটা ধরাও। এসো। ঢাকনাটা খোল।

ঈশ্বর ক্ষমা করুন আমাকে জানি না এ আমি কি করছি। শীতাংশু কান্তি মিখাএল একটানে ঢাকনাটা খুলে ফেললেন। তাঁর নাক একরাশ বিষণ্ণ গন্ধকে লুফে নিল, যেন পুরোনো ফুলগুলো জলের ভেতরে মরে যাচ্ছে। ছুরীকাঁচির ঘষটানিতে একটা ধাতব আর্তনাদ জাগল এবং মৃত লোকটির বাঁদিকের পাঁজর ঘেঁষে একটা বাঁকানো ইস্পাতের ফলক বিনাভূমিকায় ঢুকে গেল। মানুষের ঘৃণাকে ছাপিয়ে উঠল ভাস্করের চিত্রীর কৌতূহল। পরপর বাইশটি রাত নিষিদ্ধ ফলের লোভে লাশকাটা ঘরে মৃত মানুষের হাত পা মাথা বুক পেট শিরা-উপশিরা তন্তু মজ্জা মিখাএল ছিঁড়ে কেটে দেখলেন। প্রবল প্রতাপান্বিত মহান পোপের তর্জনীর খাড়া সংকেতে শাসিত মধ্যশতকের য়োরোপ মিখাএলের এই গোপন নৈশাভিসারের খবর পেল না। ছবি আঁকতে বা পাথরে মূর্তি কুঁদে তুলতে গিয়ে শরীর-বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ পাঠ নেয়া সেদিন

খৃষ্টধর্মে নরহত্যার পাতকস্পে সিদ্ধ হত। ভারী কিমোনো গোছের পোষাকে ঢাকা শরীর আর মোমছাঁচ মুখ নিয়ে ফ্লরেন্টাইনরা পথে-ঘাটে হেঁটে যাচ্ছে, সাদা চোখে তাদের যেটুকু দেখার দ্যাখো। নগ্ন বা মৃতদেহকে তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে দেখে তার আদলে শিল্প-টিল্প করা চলবে না।

অথচ সিসটিন শ্যাপেলের গায়ে 'আদমের নবজন্ম' ঐ নৈশাভিসাবের প্রবল ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ব্যতীত পববর্তী রেনেসাঁসের চোখের সামনে অমন একান্ত প্রতীকী হয়ে ফ‍ুটে উঠত না। কখনো মনীষা প্রাক্তনকে অগ্রগমনের অধীরতায় অস্বীকার করে। কয়েকটি বিষণ্ণ শতকের অনালোক কাল পেরিয়ে পনের শতকের বুক ভেঙে হেলেনীয় অস্তগত সবিতার উত্তরাধিকার নিয়ে অলজ্জ ভোগবাদী ফ্লরেন্স সেদিন গারগানতুষার মত অতিস্ফীত হয়ে ফেটে পড়ছিল। দেবদূতের ডানার দরকার নেই—মানুষের একটা কাটা হাত, ছেঁড়া পা—তাই-ই সই। অ-মানুষিক থেকে মানুষিক জগতে পৃথিবীর বাঁকা জেদী ঘাড় জোর করে ঘুবিয়ে দেযার যজ্ঞ সেদিন শুরু হয়েছিল। সে যজ্ঞে বহু যাজ্ঞিক একটি মূল পুরোহিতকে ঘিরে মেডিকি বাজবাড়ীর খোপে খোপে অবিচলিত ভ্রমরেব মত বাসা বেঁধেছিলেন। সেই পুবোহিত ফ্লরেন্সের একছত্র শাসক লরেঞ্জো দ্য মেডিকি। যাকে বলা হয় 'Single favourite topic of conversation' য়োরোপের মধ্যযুগীয় ইতিহাসের পাতায় লবেঞ্জো ছিলেন জনপ্রিয়তার মাপ-কাঠিতে ঠিক তাই।

তিনি অসীম বিত্তবান পুরুষ ছিলেন। ইতালীব অঞ্চল রাষ্ট্রগুলিব প্রতিনিধিরা, তুরস্ক ও চীনের প্রবল পবাক্রান্ত রাজন্যবর্গের দূতবৃন্দ হামেশা তাঁর রাজসভায় যাতায়াত করতেন। অথচ এ এক অবিশ্বাস্য সত্য, লবেঞ্জোর সৈন্যদল ছিল না, প্রহরী ছিল না। ফ্লবেন্সের রাস্তায়-রাস্তায় সাধারণ পথচারীর মত নিঃসংকোচে পুত্র-কন্যার হাত ধরে তিনি ঘুরে বেড়াতেন। নিজের বাবহারের জন্যে কয়েকটি কক্ষ নির্দিষ্ট রেখে রাজপ্রাসাদের অন্যসব ঘবগুলি যাঁরা পৃথিবীতে শিল্প সংস্কৃতি বিজ্ঞানের নতুন যুগ আনতেন, তাঁদের জন্য খুলে দিযেছিলেন। সুতরাং লরেঞ্জো মানুষের জিভে জিভে ফিরতেন। রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে তাঁর কর্তৃত্ব ছিল সম্পূর্ণ একক। অথচ লরেঞ্জোর পিতা পিএবো দা মেডিকি বা তাঁর সুখ্যাত পিতামহ কসিমো পর্যন্ত এত সর্বব্যাপক জনপ্রিয়তায় সিক্ত হতে পারেননি। ফ্লরেন্সের লোক ইচ্ছে করলে একঘণ্টার নোটিশে লরেঞ্জোকে প্রাসাদ থেকে লাথি মেরে বের করে দিতে পাবত। একথা ফ্লরেন্টাইনরা যেমন জানত, লবেঞ্জোও জানতেন। ফলতঃ শাসকের সঙ্গে জন-সাধারণের সম্পর্ক কখনোই একপক্ষের ঔদ্ধত্য বা অপরপক্ষের ভীরুতায় পর্যবসিত হত না। মাত্র সতের বৎসর বয়সে প্রাণপণ করে সেই যে একবার

লরেঞ্জো পিতা পিএরোকে এক দারুণ মিলিটারী ক্য থেকে বাঁচিয়েছিলেন, তারপর তাঁকে আর কখনো অস্ত্রসন্ধান করতে হয়নি।

ফ্লরেন্সের অযুত পণ্যসম্ভার পৃথিবীর বাজারে বাজারে চাহিদার ঠেলায় সেদিন উপচে পড়ত। মহাসাগরের তরঙ্গে বাণিজ্যপোতের রজতশুভ্র পালের নিশ্চিন্ত আড়ালে চারদিকে ছাপিয়ে আসত তাল তাল সোনা। লরেঞ্জোর ঐশ্বর্যের সেই হিরণ্যদ্যুতি বহুজনকে অন্ধ করে রাখত। তাঁর যাদুকরী শাসন পদ্ধতি লক্ষ লোকের মনে পরম বিস্ময় জাগাত। কিন্তু শিল্পী, সংস্কৃতিবিদেরা তাঁকে শিরোপা দিয়েছিলেন তাঁর বন্ধনমুক্ত চিত্তের অনন্যতার জন্যে। যে চিত্তের স্বাধীনতাকে সমগ্র প্রতীচ্য হাজার বছর ধরে স্যাঁতস্যাঁতে অন্ধকার গরাদখানায় পুরে রেখেছিল, লরেঞ্জো তার শিকল ভাঙায় প্রথম ব্রতী। তাঁর প্রজ্ঞাদীপ্ত ব্যক্তিত্বের কমলবনে সেদিন বুদ্ধিজীবী ও ভাবী যুগের স্রষ্টাদের মেলা বসেছিল। রেনেসাঁসের দিশাহারা প্রথম পুরুষদের লরেঞ্জো তাঁর প্রবল ব্যক্তিত্বের মাধ্যাকর্ষণে একটি সুডৌল বৃত্তের মধ্যে নিয়ে এসেছিলেন।

এদিকে প্রস্তর-নগরের পথে পথে ছেনী বাটালি নিয়ে কিশোর মিখাএল ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পাথরের বুক থেকে দুধ আর মাংস খুঁজে বের করার জন্যে। নামী শিল্পী ঘিরল্যাণ্ডাইওর স্টুডিওর শিক্ষানবিশী করতে করতে এঞ্জেলো তখন ক্লান্ত। স্কেচ করতে ছবি আঁকতে, গুরুর আঁকা ফ্রেসকোতে রং বুলোতে আর ভালো লাগে না। দিকপাল ভাস্কর উনতেল্লো তাঁর সুযোগ্য শিষ্য বারতোল্-ডোর হাতে প্রস্তর-সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার দিয়ে সদ্যগত হয়েছেন। ক্যানভাস নয় আমি পাথরের ওপর ছবি আঁকব। ঈশ্বরের শুভ্র পবিত্রতার মত পাথর। নববধূর মত পাথর। ওকে জোর করে আয়ত্তে আনতে চাও, অধীর হাতুড়ীর প্রবল আঘাত কর, নিষ্ঠুর কঠিন ঔদাসিন্যে যে তোমাকে ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু পরম সহিষ্ণুতার সাথে ছেনীবাটালি দিয়ে আস্তে আস্তে ঠুকে ঠুকে পরতের পর পরত পাথরের ঘোমটা খসাতে থাকে, এক সময় সে মূর্তিমতী দয়ার মত তোমার আনত ব্যাপৃত ভুজবন্ধনে ধরা দেবে। আমি উনতেল্লোর সাম্রাজ্যের অধুনা অধীশ্বর বারটোল্‌ডোর কাছে যাবো।

কিন্তু তার আগেই ঘিরল্যাণ্ডাইওর স্টুডিওতে ইগলচক্ষু লরেঞ্জো একদিন নিয়তির মত এলেন ও শিক্ষানবিশীদের কাজকর্ম দেখতে দেখতে মিখাএলকে ছোঁ মেরে সোজা প্রাসাদে তুললেন। রাজানুগ্রহ, উজ্জ্বল স্বপ্নগুলিকে ফোটানোর অফুরন্ত সম্পদ ও সময়, সর্বোপরি বারতোল্‌ডোর শিষ্যত্ব—সমস্তই নবীন ভাস্করের হাতে ধরা দিল।

পনের শতকের ফ্লরেন্সে রেনেসাঁসের অস্থির পদকম্পনে প্রাচীন বিশ্বাস ও প্রাক্তন নির্বোধ সংস্কারাদির স্তম্ভগুলো তখন বিরাট অভিমানে ভেঙে পড়ছিল।

প্রচলিত সত্যবোধে ক্রমশঃ বিশ্বাস হারাতে হারাতে সমগ্র প্রতীচ্য যখন ভাবদৈন্যে দেউলে হয়ে পড়েছিল, তখন কেবলমাত্র মিখাএল, রাফাএল বা দা ভিঞ্চির মত শিল্পীদের পক্ষে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর সামনে নবযুগের স্বর্নিল দিগন্তরেখাকে পরিস্ফুট করা সম্ভব ছিল না বলা বাহুল্য। সমাগত মূর্তি ছবি ও ফ্রেসকার মাধ্যমে পালাবদলের যুগের যে বিশিষ্ট ভাব ও ভাবনাগুলিকে তাঁরা বিশ্বস্তভাবে ফুটিয়েছিলেন, তার পশ্চাদভূমি রাতারাতি তৈরী হয়নি। এঁদের কর্মিষ্ঠ চেতনাকে যাঁরা শিক্ষিত, দীপ্ত ও চালিত করেছিলেন, সমকাল তাঁদের ধূসরতায় নিক্ষেপ করেছে। কারণ কিছু অজ্ঞতা, কিছু ক্ষমাহীন ঔদাসীন্য, বাকীটা প্রাজ্ঞ মনন-শীলতার প্রতি অর্ধ-শিক্ষিত সাধারণের মারাত্মক ভীতি। এক-আধটা মিখাএল এঞ্জেলো বা রাফাএলে রেনেসাঁসের বসন্ত আসেনি। লরেঞ্জো দ্য মেডিকির দিগন্তকারী প্রচেষ্টায ও পিপীলিকা-সংগ্রহে ফ্লরেন্সে বহু মনীষার প্রয়োগক্ষেত্র রচিত হয়েছিল।

যাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় কালের ঘর রেনেসাঁসের ফসলে ভরেছিল তাঁদের গোষ্ঠিবদ্ধ নাম প্লেটো আকাদামী। একটি শতাব্দীর সন্ধ্যায় নীল কামিজ পরিহিত শীর্ণদেহী কিশোর মিখাএল গুরু বারতেল্‌ডোর হাত ধরে লরেঞ্জোর স্টুডিয়ালোতে প্লেটো আকাদামীর বিশ্ববন্দিত গুণিদের সামনে যেয়ে দাঁড়িয়ে-ছিলেন। প্লেটো আকাদামীকে বলা হত য়োরোপের মানস-স্পন্দন, সাহিত্য ও সাংস্কৃতির বহতা নদী, এবং সেই নদী যার স্রোতে কেউ দুবার স্নান করে না, দ্বিতীয় এথেন্স, একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও মুদ্রন প্রতিষ্ঠান। শতায়ু ওকের পাটায় হাজার হাজার বই ও নির্ভরযোগ্য পাণ্ডুলিপি, গ্রীকরিলিফের অগণিত সমাবেশ, ছাদ থেকে শিকল দিয়ে নামিয়ে আনা স্বল্প পরিসরে তীব্রালোকিত পরিবেশ—এরই মাঝখানে প্লেটো আকাদামীর চন্দ্রসভা ও মুখোমুখী বিমূঢ় বিব্রত মিখাএল এবং স্মিত বারতোলডোকে ঘিরে একটি শতাব্দীর সন্ধ্যা।

টেবলের একেবারে ডানদিক ঘেঁষে নির্লিপ্ত প্রৌঢ় মারসিলিন্ড ফিসিনো গাঢ় প্রসন্ন কণ্ঠে কথা বলছিলেন। ফিসিনো লরেঞ্জোর পিতামহ কসিমোর পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বপ্রথম প্লেটো আকাদামীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। চিন্তা-বৃত্তির পরিণতিতে ক্ষীণাংগ ফিসিনো ছিলেন নিশ্চিত নৈরাজ্যবাদী। যদিচ তিনি বিশ্বাস করতেন সমস্ত আলোকের পরিণামই নামহীন আকারহীন অন্ধ-কারে, তবুও প্রবল প্রাণশক্তির তাগিদে তিনি প্লেটোর সমস্ত আবিষ্কৃত রচনার অনুবাদ করেছিলেন। এ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে আলেকজান্দ্রিয়, কনফুশীয় ও জরথুস্ত্র মনীষীদের কালজয়ী দর্শন ও মৌল সৃষ্টির সমস্ত সম্ভারগুলিকে তিনি মধ্য-শতকগুলির সামনে উদ্ঘাটিত করেছিলেন। প্রাচীন মিশরীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর ব্যাপক জ্ঞান ছিল। চিকিৎসা শাস্ত্র, প্রকৃতি বিজ্ঞান, মুদ্রণ

পদ্ধতি প্রভৃতির ফলিত প্রয়োগ ঘটিয়ে ফিসিনো ফ্লরেন্সে তথা সমগ্র য়োরোপে সেদিন যুগান্তর এনেছিলেন। তাঁর রচনাসম্ভার প্রতীচ্যের চিন্তাবিদদের মানস রাজ্যে অধৈর্য নাড়া দিয়েছিল। দলে দলে তীর্থযাত্রীর মত ফিসিনোর শান্ত রম্য বাসগৃহে নানা দেশের মনীষী-সংগম ঘটত। কসিমো দ্য মেডিকি তাঁর সভাস্থপতি মিখাএলেঞ্জোর সহায়তায় ফিসিনোকে স্থায়ীভাবে বেঁধে রাখবার জন্যে কারেগ্গির শৈল-নগরীতে একটি অনুপম প্রাসাদ তৈরী করে দিয়েছিলেন। প্রাসাদের সামনে প্লেটোর একটি বিশাল প্রস্তরমূর্তি। তাঁর বলিষ্ঠ দক্ষিণবাহু ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত। পায়ের নীচে অগ্নিপাত্রে অনির্বাণ দীপশিখা। এবং একটি ফলকে ক্ষোদিত প্লেটো সম্পর্কে ফিসিনোর সেই প্রসিদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি 'যিশুর প্রিয়তম শিষ্য।'

ফিসিনোর সংগে যে সৌম্যদর্শন বয়স্ক পুরুষটি কথোপকথনে ব্যস্ত ছিলেন তাঁর নাম খ্রিষ্টোফোরো ল্যাণ্ডিনো। ল্যাণ্ডিনো লরেঞ্জো ও তাঁর পিতা পিএরো উভয়েই শিক্ষক ছিলেন। লেখক, বক্তা ও যুক্তিবাদী চিন্তাবিদ ও প্রাকৃতিক নিয়মাদিব বৈজ্ঞানিক কারণসন্ধানী হিসেবে ল্যাণ্ডিনো তাঁর যুগে একক ছিলেন। 'রেনেসাঁসের জবরদস্ত পুরুষ' বলে পরবর্তী কাল তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। রাজার ব্যক্তিগত উপদেষ্টা হিসাবে রাজনীতি ক্ষেত্রে সুপরিণত প্রভাব অর্জন করা তাঁর পক্ষে আদৌ কঠিন হয়নি। মনীষী দান্তের সামগ্রিক সাহিত্যকৃতি তাঁর প্রভূত জ্ঞান ও নিরন্তর ধারণা জাগাতে বিশেষ সহায়তা করেছিল। ফ্লরেন্সে প্রথম প্রকাশিত দান্তের গ্রন্থাবলী সংলগ্ন ল্যান্ডিনো রচিত মুখবন্ধ ও টিকা দান্তে-বিশেষজ্ঞদের মতে আজ পর্যন্ত অনন্য।

উনিশ শতক ও বিশ শতকের গোড়ার কাল পর্যন্ত মধ্যবিত্ত বাঙালী বুদ্ধিজীবীর কাছে বাংলাভাষার অসম্মান মর্মান্তিক হলেও অভূতপূর্ব নয়। ইতালীআন, শ্লাভ বহু আধুনিক ভাষাকেই যুগে যুগে এই একই অবমাননার বেদনাদায়ক সেতুবন্ধ পেরিয়ে মুক্তির দিকে যেতে হয়েছে। একদা অখ্যাত ও নিন্দিত ইতালীআন ভাষাকে কেবল একক প্রচেষ্টায় লান্ডিনো যেমনভাবে শ্রদ্ধেয় এবং বুদ্ধিজীবীদেরও নির্ভরযোগ্য ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন, বিশ্ব-সাহিত্যে তার তুলনা মেলে না। প্লিনি, হোরেস, ভার্জিল প্রমুখ মহান সাহিত্যিকদের রচনার অনুবাদ করে ল্যান্ডিনো ইতালিআন সাহিত্যের দিগন্ত রেখাকে বহুধা বিস্তৃত করেছিলেন। তাঁর সেই বহু-কথিত উক্তিটিকে ফ্লরেন্স শিরোভূষণ করেছিল 'বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিন্তা ও বাস্তবজ্ঞানই একমাত্র মহৎ সৃষ্টির উৎস।' প্লেটোর 'রিপাবলিকে'র নায়কের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করতে যেয়ে বলা হয়েছে 'নগরের আদর্শ শাসক হওয়ার যোগ্য একমাত্র জ্ঞানী পুরুষ।' ল্যাণ্ডিনো এই উক্তিতে লরেঞ্জোকে ভূষিত করেছিলেন।

ডিভান থেকে উঠে সর্বপ্রথম যিনি মিথাএলকে অভিবাদন করলেন তাঁর নাম এঞ্জোলো পলিজিআনো। পলিজিআনো তখন মধ্য তারুণ্যে উপনীত। তিনি ছিলেন লরেঞ্জোর থেকেও অপ্রিয়দর্শন। এবং প্লেটো আকাদামীর সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রতিভা। মাত্র দশ বৎসর বয়সে লাতিনে গ্রন্থ প্রকাশ করে পণ্ডিতদের মহলে তিনি অবিশ্বাস্য চাঞ্চল্য এনেছিলেন। সুতরাং পলিজিআনোর প্রথম শৈশবেই গুণগ্রাহী লরেঞ্জো তাঁকে প্রাসাদকক্ষে নিয়ে এলেন ও ল্যাণ্ডিনো, ফিসিনো এবং অন্যান্য সেরা গ্রীক পণ্ডিতদের ওপব তাঁর শিক্ষার ভার দিলেন। লরেঞ্জোর স্বপ্ন সফল করে মাত্র ষোল বৎসর বয়সে পলিজিআনো হোমারের 'ইলিয়াদে'র প্রথম খণ্ড অনুবাদ করলেন। এই অ-সুন্দর পুরুষটার সর্বাধিক খ্যাতি ছিল কবি হিসাবে। বিশেষজ্ঞদের মতে পেত্রার্কা ছাড়া ইতালীয় কবি-কুলের মধ্যে তাঁর সমদক্ষতা সম্পন্ন কবি মধ্যযুগে আব কেউ ছিলেন না। প্যাজিব কুখ্যাত ষড়যন্ত্রে নিহত লবেঞ্জোব ভ্রাতা গুলিআনো দ্য মেডিকিব শৌর্যের আখ্যান অবলম্বনে পলিজিআনো একটি বিবাট বিবৃতিমূলক কাব্যরচনা কবেন। কবিতাটি আংগিক ও বস্তুধর্মের দিক থেকে বহুকাল কবিযশঃপ্রার্থীদেব কাছে একটি বিশিষ্ট মডেল হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

সেই কক্ষে তখন প্লেটো আকাদামীব কনিষ্ঠতম সদস্যটিও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর নাম পিকোদোল্লা মিবানদোলা। বেনেসাঁসেব ভাস্কর ও চিত্রীবা তাঁকে একযোগে অভিনন্দন জানিযেছিলেন যোবোপের সবচেযে সুদেহী ও সুদর্শন পুরুষ বলে। তাঁব ওষ্ঠের গুণীজনোচিত তাচ্ছিল্যের বিদ্যুৎ-বিলাস, ললাট প্রান্তকে বেষ্টন কবে অযত্ন স্খলিত স্বর্ণাভ কেশগুচ্ছ, সাগরের দু ঝিনুক নীলের মত দুই আযত চোখ, অপূর্ব গঠন সবই তাঁব সমযে থেকে পববর্তী দীর্ঘ কাল পর্যন্ত শিল্পীদের 'লোভনীয় শিল্প-খাদ্য' হিসাবে সাগ্রহে গৃহীত হত। বাইশটি বিভিন্ন ভাষা জানতেন পিকো। প্লেটো আকাদামীর বষীযান সদস্যবয প্রায়ই সস্নেহে উল্লেখ করতেন যে কেবল মাত্র খুঁজে না পাওয়ার দরুণই মিরানদোলা তেইশ নম্বর ভাষাটি শিখতে পারেননি! ভালবেসে ফ্লরেন্স তাঁকে কখনো 'ইতালীর মহান ঈশ্বর' 'সুন্দরতম ও প্রিয়তম' এইসব নতুন নামে ডাকত। সুখ্যাত জীবনী-উপন্যাস প্রণেতা আরভিংস্টোন মিরানদোলার সংস্কৃতি-প্রচেষ্টাকে বিচার করতে যেয়ে বলেছেন—

"His intellectual concept was the unity of knowledge ; his ambition to reconcile all religions and philosophies since the beginning of time. Like Ficino, he aspired to hold in his mind the totality of human learning."

মিরানদোলা স্থির বিশ্বাসে উপনীত হয়েছিলেন যে পৃথিবীর সমস্ত ভাষা-

গোষ্ঠি একটি আন্তর্জাতিক মহাভাষার উৎস থেকে প্রবাহিত ও কালক্রমে দেশ ও সময়ভেদে পরিবর্তিত। আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদেরা ভাষাতত্ত্বের ঐতিহাসিক গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে প্রথম পথপ্রদর্শক হিসাবে শ্রদ্ধার সংগে মিরানদোলাকে স্মরণ করে থাকেন।

ফ্লরেন্সে তখন মরুসন্ধতার কাল। প্লেটো আকাদামীর সদস্যবৃন্দ প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন, ঈশ্বর আর চার্চের মাঝখানের ফাবাকটা ক্রমশঃ বড় হচ্ছে। তাছাড়া ভগবান ও স্বৈরতান্ত্রিক পোপের মধ্যে আপোষে রফা হতে প্রায়ই গোলমাল হচ্ছে। তাছাড়া রোমের পোপ সিক্স্টাস এমন সর্বনাশা রাজনীতির সংগে জড়িয়ে পড়েছেন যেখানে সৎ ও বিবেকী খ্রীশ্চানের পক্ষে তাঁর অনুশাসনের সম্মান রক্ষা দুরূহ হয়ে পড়েছে। যেহেতু প্লেটো আকাদামীর পৃষ্ঠপোষক লরেঞ্জো, স্বভাবতই মহান পোপ ফ্লরেন্সের এই শাসকটিকে বিষদৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেন। অতঃপর যখন প্রমাণিত হয় কুখ্যাত প্যাজী ষড়যন্ত্রে লরেঞ্জোর ভ্রাতার হত্যার পেছনে পোপের হাত ছিল, তখন ফ্লরেন্স আর রোমের মধ্যে সরাসরি বিচ্ছেদ ঘটে। পোপ ফ্লরেন্সের যাবতীয় চার্চকে অবৈধ বলে ঘোষণা জারী করেন ও পরিবর্তে ফ্লরেন্সেও প্রকাশ্যে অসৎ ও পক্ষপাতদুষ্ট পোপকে খ্রীষ্টধর্মের প্রধান হিসাবে স্বীকৃতি দিতে নারাজ হয়। সমগ্র যুরোপে মধ্যশতকগুলিকে ঈশ্বর যখন পাকাপোক্তভাবে সমাজ, সম্প্রদায় ও উদ্দেশ্য প্রণোদনায় প্রত্যক্ষ শিকার হয়ে উঠেছিলেন ও পবিত্র ধর্মসংগ্রামের নামে যত্রতত্র ঈশ্বরের রক্তপাত ঘটছিল, তখন মধ্যযুগীয় ভণ্ডামী ও মূঢ় আত্মরতির ওপর প্লেটো আকাদমীর বিজ্ঞান সম্মত নতুন জীবন-বেদ, যুক্তি ও তথ্যনিষ্ঠা, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ও নির্ভীক বক্তব্যের অকুণ্ঠ প্রচারণা তীব্র কশায় চকিত হয়ে উঠেছিল। একদিকে ব্যক্তিত্বের সম্মান, প্রবল বলিষ্ঠ ভোগতৃষ্ণা, দেহের পঞ্চপ্রদীপে রূপের আরতি অপর দিকে জ্ঞানের সম্ভবপর সমস্ত উৎসের দিকে নৌচালনার মাধ্যমে যে নব্যমানবতার সাধনা লরেঞ্জোর প্রাসাদকক্ষ থেকে সমগ্র য়ুরোপে ও যুরোপ থেকে ঔপনিবেশিক জয়যাত্রার দুঃসাহসী প্রয়াসে পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে সার্থক হয়েছিল, সুযোগ্য গ্রাহক হিসাবে মিখাএল তার দায়ভাগকে ব্যক্তি ও শিল্পীজীবনে গ্রহণ করেছিলেন। প্লেটো আকাদামীর সদস্যদের কাছ থেকেই তিনি সর্বপ্রথম শুনেছিলেন যে প্রকৃত ধর্ম ও জ্ঞান আসলে একই শ্লেটের এপিঠ-ওপিঠ। শ্রেষ্ঠ মানবতার মহিমাদীপ্ত প্রাচীন গ্রীস ও রোম খৃষ্টধর্মের উদ্ভবের বহুপূর্বে কিভাবে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার মহত্তম দিকগুলিকে উদ্ঘাটিত করেছিল। এবং তারপর কিভাবে দীর্ঘকাল পৃথিবী অন্ধকার যুগের ইতিহাসের মত সব অবলুপ্তির যন্ত্রণা সহ্য করেছিল। এখন এই কটি গোনা মানুষ—বর্ষীয়ান ল্যান্ডিনো,

প্রৌঢ় ফিসিনো, কু-দর্শন পলিজিআনো, স্বর্ণকেশী মিরানদোলা—মাত্র এই কটি লোক লরেঞ্জো দ্য মেডিকির সহায়তায় কি করে পৃথিবীকে আবাব মানুষের হাতে ফিরিয়ে দিতে চলেছেন। এ'দের বীজমন্ত্র কেবল একটি শব্দ—যে শব্দ কিশোর মিখাএল বা পৃথিবী—কেউ আগে কখনো শোনেনি। সেই শব্দটি—'মানবতাবাদী।' এই শব্দটি সম্মোহেব মত মিখাএলকে আকর্ষণ করত। এর পরিপূর্ণ অর্থ খুঁজতে তাঁকে বারবার ছুটে যেতে হল প্লেটো আকাদামীব কীর্তিমান পুরুষদের কাছে।

মিখাএল, আমরা পৃথিবীকে মানুষের কাছে ফিরিয়ে দিতে চাই। ধূর্ত নয় নীচ নয়, সৎ অর্থে যে মানুষ হবে, বিবেকী হবে। আত্মার অমরত্ব চাই না মুক্ত মন চাই, জীবনের কম্পনহীন বিকাশ চাই। সে ভাবুক, দেখুক, খুঁজে নিক। যেহেতু একটি ব্যক্তির আকৃতি প্রকৃতি নিযে ঠিক দ্বিতীয় ব্যক্তিটি পৃথিবীতে ফিরে আসে না, তাই একক ব্যক্তিত্বে প্রত্যেক স্বতন্ত্র মানুষ পূর্ণ বিকশিত হোক, অসামান্য হোক।

ধর্মসংগ্রামের অন্ধতামসের ও নীহারিকার কাল কবে কেটে গেছে। তবুও সুখ্যাত চিত্র-পরিচালক ফেলিনির হেলিকপটারে গ্রথিত খৃষ্ট কি করুণ বিস্তারিত চোখে শীতল যুদ্ধেব একনায়কত্বের ও অসংসত লোভের দুঃস্বপ্নে ঘুলিযে ওঠা পৃথিবীকে দেখে ফিরছেন। শিল্পীর স্বাধীনতা, মুক্ত গণতন্ত্র, মানুষের মুক্তি ইত্যাদি কথার ভিত্তিভূমি স্বৈরশাসনের লম্পট পদচারনায় বার-বার শিউরে উঠছে। ফিসিনো, ল্যান্ডিনো, পলিজিআনো আব মিবানদোলার স্বপ্নেব বালার্ক বাগ নতুন আরণ্য যুগের নির্মিত অন্ধকাবে দিগভ্রষ্ট। মানুষকে মানুষের কাছে ফিবিযে দেয়ার জন্যে অন্ধকার হিমশীতল রাতে মিখাএল এঞ্জেলোকে লাশকাটা ঘরে যেতে হয়েছিল। সে শবসাধনার দরজা খুলতে এত বিলম্ব হচ্ছে কেন?

অরুণ ভট্টাচার্য

### কোন দুঃস্বপ্নের জাদুতে

সমস্ত রাত্রিকে নিযে একটিমাত্র দুঃস্বপ্ন দেখেছি,
সে তোমার স্মৃতি। তোমাব দীর্ঘ দেহ, চক্ষু ওষ্ঠ সমস্ত ইন্দ্রিয়ে
আমার নিষ্ঠুর ঘুম। এবং তোমার যে উজ্জ্বল বাসনা
আকাঙ্ক্ষিত শিরায় স্নায়ুতে। রক্তে প্রবাহিত।
সমস্ত রাত্রি ধরে একটানা অখণ্ড স্মৃতির অবিরল
তোমাব দেহের চক্ষু ওষ্ঠ কর্ণ সব মিলে এক সুঠাম শরীরী
কথা বলছে যেন। যেন সারারাত ধরে, সারারাত ধবে, সারারাত।

আমি মূঢ় বিবেকী বালক। কিছু বুঝতে পাবছিনা। যেন এক
প্রকাণ্ড বাড়ীর সামনে স্তব্ধ দাঁডিয়ে। স্তব্ধ। শীতল। ছায়া
গভীর প্রকাণ্ড। দুলছে, কাঁপছে অন্ধকাবে প্রকাণ্ড বাড়ীটার।
কেউ নেই, কথা বলছেনা কেউ। ভয়ে চীৎকাব করতে যাব
তোমার কি নাম। মনে পডছেনা। যেন আটকে যাচ্ছে
সব স্মৃতি সব নির্মম ইশারা। নাম
মনে পড়ছেনা। পড়ছেনা। যেন শুনতে পাচ্ছি দূবে প্রতিধ্বনি
তোমার নির্মল দেহ, চক্ষু ওষ্ঠ কর্ণ সব মিলে
এক শরীরী প্রতিমা।

প্রকাণ্ড বাড়ীটাতে শুধু তুমি আছ। একমাত্র প্রহরী জানাল।
আমি বাইরে সিংহদরজায়। উঁচু কিন্তু স্নিগ্ধ এক প্রাচীর সম্মুখে
এখনো দাঁড়িয়ে আছি, দাঁড়িয়ে থাকব। দাঁড়িয়ে থাকব, দাঁড়িয়ে......

এবং জানবো আমি, সম্ভবত নীচে
কোনদিন তুমি নামতে পারবেনা সিংহদ্বার দিয়ে।

## পলাতক প্রেমিকের স্বীকারোক্তি

তখন তীব্র সূর্য ছিল মধ্যাহ্নগগনে
গংগার মাস্তুলে রোদ জলে চিকিমিকি
আমার হাতের মুঠো তোমার আংগুলে
শক্ত স্থির একখন্ড মাংসের মত
উত্তেজনাহীন।
তোমার মুখের শিরায়
একটা শান্তির রেখা, অথচ দৃঢ়তা।
জানতে, ভবিষ্যৎ স্থির এবং আমাকে
তোমার একান্ত যা কিছু নিশ্চিত গোপন।
তোমার নিকট প্রেম জীবনসদৃশ
ততোধিক সত্য ভাবনা সুস্থ অঙ্গীকারে।

আমি চমকে চমকে উঠছি। বাববাব মুখে
দেখছি তোমাব একটি প্রত্যয়ের ছায়া
স্নিগ্ধ কিন্তু তীব্র অহংকার জুড়ে
উদ্ভাসিত। আমি অক্ষমতা দিযে ঢাকছি
নিজেরই ভীরুতা
এবং আশ্চর্য আরো
ক্রমশ নিজেকে আমি গুটিয়ে নেবার
সিদ্ধান্ত করছি। ভয, যে-অনাস্বাদিত,
তাকাতে পারছিনা ওই স্থির দুটি আঁখি-
পল্লবেব দিকে। এবং হাতেব মুঠি
শ্লথ হতে হতে চাচ্ছে। সূর্যবলয়ের
কোমল আভার মত মানসিক বৃত্তে
ঘুরছি। ঘুরছি, আমি ভয়েব আকারে
আঁকছি তোমার মুখ। ভীরু বালকের
স্বভাবে ভয়ের চিহ্ন আমাকে জড়িয়ে।

আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। সুস্থ, কেননা
তোমার প্রেমের ভীষণতা থেকে দূরে
বহুদূরে আমি আছি আপনার সংকীর্ণতা নিয়ে
আমিই সে মূঢ় বালক, পালিয়েছি দূরে।

## যেমন ভাবছি

আমার নানাবিধ ভাবনার কথা ঘাসে গাছে কিম্বা
ফুলের অন্তরালে লুকিয়ে রাখতে চাচ্ছি। আপাতত
এই আমার অন্তিম ইচ্ছা।

যে যেমন ভাবছে আমার তাইতে একান্ত সংগোপন ভাবনা।

সুতরাং ঘাসে গাছে ফুলে কিম্বা যেসকল মৌমাছি
ঘোরাফেরা করে' যাবতীয় সংবাদ আনছে কানে কানে,
তাদের আমাকে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছেঃ

আমার কাছে এসে বিরক্ত কোরোনা। আমার
নানাবিধ ভাবনার কথা তোমাদের অন্তরালে
লুকিয়ে রাখতে চাচ্ছি। তোমরা সরে যাও সম্মুখ থেকে।
সরে যাও। বাম করতলে মুখ ঢেকে আমি
লুকিয়ে থাকবো যে কদিন আছি এ সংসারে।

## ভয়াবহ অতীতের শব

জীবনানন্দের কথায় একদা আমারো ঠিক বিশ্বাস জন্মায়নি
ভাবিনি আমরা সকলে এক নিদারুণ যন্ত্রণায়
বাস করি। ভাবিনি যে অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
অন্য এক নিগূঢ় চেতনা খেলা করে খেলা করে।

কৈশোরে জীবনানন্দ পড়বার পর দীর্ঘ দীর্ঘ সময় গিয়েছে।

আজকাল মনে হচ্ছে জীবনানন্দ যা বলতে চেয়েছিলেন
তার চেয়েও নির্মম নির্মমতর কাহিনী রয়েছে।

এবং সম্প্রতিকালে এতাদৃশ ধারণা জন্মাচ্ছে,
মনুষ্যমাত্রই এক ভয়াবহ অতীতের শব
মুখ গুঁজে পড়ে থাকছে বছর বছর ধবে অচেতন হয়ে।
হয়তো বা মন্ত্রবলে কখনো জাগছে কিম্বা চোখ মেলছে ধীরে
অসহায় পশুর মত গোঙাচ্ছে শুধুমাত্র দুচার সেকেন্ড।

তারপর পড়ে থাকছে একসঙ্গে পাশাপাশি তারা,
দুইটি কুকুর এবং কয়েকটি বিড়ালের শব
অন্ধকারে লেপটে আছে। দূরে কাছে ভৌতিক প্রলাপ
অনুভবে একমাত্র এ মুহূর্তে মনে হতে পারে।

কযেকটি সংক্ষেপিত লঘু কবিতা

১ কে হে তুমি অর্বাচীন ডাকছ এই নিস্তব্ধ রাত্রিতে
একটু একটু প্রহেলিকায় ভেঙে চুবে সুচিব বিন্যাস
কে হে তুমি মূঢ় ছোকরা নাম ধরে চিৎকার করছ
আমাকে ঘুমোতে দাও। দুঃস্বপ্ন ভাঙতে দাও ক্রমে।

২ আমি একটা সবুজ পাখি কালকে ধবেছি সন্ধ্যেবেলা
রাত্রিবেলা তাকে নিয়ে আদর করেছি। আমি আরেকটা
নীল পাখি আনতে বলেছি। তাকেও রাখবো একদিন কাছে।
পরদিন সব জানলা খুলে দিযে অতীব প্রত্যূষে
দুটিকে একসঙ্গে দেবো আকাশের অন্তিমে ভাসিয়ে।

৩ কয়েকটি বাচাল যুবা নিরন্তর গাছে চড়তে চড়তে
ভেংচি কাটলো একসঙ্গে সুনির্মল আকাশের প্রতি।
নিম্নে তাকাতে গিয়ে একটি হলুদ ফুল চোখে পড়ল যেই
সংক্ষেপে সকলে মিলে ঈশ্বরের নামে কিছু শপথ শোনালো।

৪ আমাকে বিমলা নাম্নী মেয়েটি একবার
ভালোবাসতে চেয়েছিল।
তাইতে কমলা নামে দ্বিতীয় মেয়েটি
একটা লাল পশমের সোয়েটার বুনে
পরবর্তী শীতকালে উপহার দিল।

শোভন সোম

## হঠাৎ যে কে .

হঠাৎ যে কে বুকের মধ্যে ডেকে উঠলো, শোভন
ঝাপটা খেয়ে প্রতিধ্বনি ফিরিয়ে দিলো, শোভন
অন্ধকারে পথ হারালে যেমন কণ্ঠে ডাকে, তেমন আমায়
ঝাপসা কণ্ঠে বালক কণ্ঠে কে ডাকলো ফের এমন মধ্যবেলায়!
তীক্ষ্ম ছুরির মতন আমার কানে বিঁধলো. . শোভন....

দীর্ঘ ক্লান্ত উটের সারির দিন চলেছে পৌনপুনিক দিন
চিবিয়ে কাঁটা রক্ত গড়ায় কষে
কেবল বালি অসীম বালি বালির পরে বালি কেবল বালি
আকাশ পুড়ে খাক হচ্ছে, পায়ের নিচে বালি তপ্ত বালি
ভীষণ আলোয় হারিয়ে গেছে দিক দিগন্ত অন্ধকারের মতন
ঘুমে মলিন ঝাপসা কণ্ঠ কানে বিঁধলো যেন তীক্ষ্ম ছুরি
হঠাৎ যে কে এমন করে ডেকে উঠলো, শোভন!
বালিব পরে বালির স্তূপে প্রতিধ্বনি ফিরিয়ে আনে, শোভন .....

কোনো হাতের কোমলতার, কোনো চোখের ছায়ার শীতলতা,
কোনো প্রেমের গভীর দীঘি, কোনো স্মৃতিব বিলোল মদিবতার
কোথাও কিছু চিহ্ন নেই, এমন কি নেই কুটিল মরীচিকার
হাতছানিও......দিন চলেছে পৌনপুনিক উটেব সারির মতন
হাওয়াব শাসন মুছে দিচ্ছে পিছন দিকে পায়ে চলার দাগ
ঘোর নেশায় পেরিয়ে যাচ্ছি কোনখানে কোন দেশের থেকে কোথায়
কোথায় যে এই মধ্যবেলায় এমন একা বুকের ভিতর হঠাৎ
মলিন কণ্ঠ বলে উঠলো, শোভন

চিনতে আমি পারছিনা কে এমন ভাবে ডেকে উঠলো, শোভন
কোথাও চেনার চিহ্ন নেই, সকল চেনা ভুলে গিয়েছি, চেনার
সহজ সূত্র মেলেনা আর, সকল দাগ হাওয়ায় মুছে গেছে
আলোর ভীষণতার ভিতর দিক দিগন্ত কোথাও নেই, যেমন

আলোর ভীষণতার ভিতর দিক দিগন্ত হারিয়ে গেছে যেমন অন্ধকারে
বক্ষ জুড়ে দারুণ তৃষ্ণা, নেশার ঘোরে পেরিয়ে যাচ্ছি কোথায়

জলের মতন কণ্ঠে আমায় হঠাৎ যে কে ডেকে উঠলো, শোভন .
ভ্রষ্ট স্মৃতির কোথাও নেই দীঘির বেখা। .বুঝি কোথাও ছিলো
কঠোর রোদে শুকিয়ে গিয়ে বালির নিচে জলের কণ্ঠে
কেঁদে মরছে, শোভন ?

## মিত কথন

শান্তিকুমার ঘোষ

"বিযাত্রিচে, একটি প্রহব হোলো সম্পূর্ণ নিটোল।
যখন সকালে দেখা প্রথম সোনাব আলো নেমেছে চুলেব গুচ্ছে;
আয়ত ভ্রমব চোখে শরতের প্রসন্নতা।
কী যে হোলো—দুষ্টুমি ছিল বা মনে—ফেললাম প্রশ্ন করেঃ
'জলযোগ মেলে এমন দোকান কোনো পাবো এই পথে ?'
হার মানো নি কো তুমি। বলেছিলে প্রীত হেসেঃ
'ওদিকে আমিও যাচ্ছি, দেখাতে পারবো তাই সঙ্গে আসো যদি।"
এভাবে দিনেব শুরু প্রভাতেব শুভদৃষ্টি সন্ধ্যায উঠলো ফলে
বিধুর চুম্বনে।
একসঙ্গে পথ চলাঃ ফাল্গুন হাওয়ায় গড়া পথ যেন স্বচ্ছ লঘু
নীলিমায় মাজা;
সবে গিয়ে হর্ম্যসারি অন্তরের রূপ শুধু মগ্ন স্থপতিরঃ
যতগুলো সাঁকো
বন্ধুতায় ঘিবে রয় নদী-নগরীর জল। পথ চলা এক সাথেঃ
পথের আনন্দ যেন মুক্ত আলো সুড়ঙ্গের অন্ধকার ছিঁড়ে;
হঠাৎ টিলার বাঁকে সমুদ্রের রূপ। করতালি দিযে তুমি উঠেছিল বলে
'মাটিতে পা বেখে দৃঢ় মাথা আমি তুলে দেবো ঊর্ধ্ব মেঘপানে।'
আমিও প্রগাঢ় স্বরে জানিয়েছি ধীরেঃ
'দিনের সংগ্রামে ক্লিষ্ট সমতল থেকে প্রাণ
চায় আজ পাহাড়েব ছায়া, ঝর্ণার অবাধ খুশি, কাছের আকাশ।

মন্থর মেঘের রাশি বেদনার স্পর্শে ছিলো তারুণ্যের দিনগুলি—
তোমার দাক্ষিণ্যে হোলো দীপ্ত বেগবান।"
"যা ভাবিনি দূরতম স্বপ্নে কোনোদিন
তা-ই যদি কান্তি নিলো, হোলো গান হাসি, তবে কেন
এত শীঘ্র হবে হর্ষ শেষ
তুমি আকস্মিক ছুটে-আসা অগ্নিতারা সোনার লিখন এঁকে
আমার নিকষে
মিলাবে তৃষিত শূন্যে।
যেন দুই দারুখণ্ড অসীম সাগরে, একবার মুখোমুখি ঢেউয়ের চূড়ায়:
তুমুল তরঙ্গ এসে পরক্ষণে করে দেয় বিচ্ছিন্ন সুদূরে।
পলাতক দণ্ড পল, পিচ্ছিল মুহূর্তগুলি। এখনি সচল হবে
প্ল্যাটফর্মে স্পন্দমান ক্রূর লম্বা ট্রেন।
রইবে সম্বল পিছে কাগজে আঁচড় দ্রুত তোমার ঠিকানা।"
"যত বড়ো ভাবো তুমি তেমন বিশাল নয় ঘনিষ্ঠ পৃথিবী।
এই চেনা রাস্তা বেয়ে যত দূর যাই কেন ফিরে ফিরে আসা দ্বারে
অন্তঃশীল টানে।
দুঃখের বলয় ঘূর্ণী, সপ্ত সিন্ধু পিছে রেখে একই ঢেউ
ঘাটে আনে আবার তরণী।
রমণীয় জনস্থানঃ আলোকিত উপস্থিতি; ছাড়াতে না চায়
সঙ্গ লাগে এত প্রিয় যাকে--
তার ছন্দে বাঁধা পথ বিচ্ছেদের শীর্ষে শীর্ষে,
তার মুখ মনে নিয়ে প্রদক্ষিণ করে আসি আমেরু নিখিল।"

## নিসর্গ নিপুণ অতি

নিসর্গ নিপুণ অতি ছোঁড়ে পুষ্পবাণ;
শূন্যে তুলে ধরে মেঘ মুক্ত স্তনচূড়া;
সঙ্গমের কিছু ঊন ফেনিল ঘূর্ণির টান
ঊর্মিল সিন্ধুর।
প্রকৃতি সমুদ্র ছার—
বালকের মতো রূপে এক ত্রয়োদশী
উন্মাদনে ভরে হ্রস্ব আমার যামিনী॥

## শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায়

### ল্যাম্পপোস্টের নীচে

ঠিক এই মুহূর্তে কিছু মনে আসছে না
যা বলে তোমার মন পাওয়া যাবে—
কতদিন কত কথা বলেছি, অনেক ভেবে
তাব দু'একটি কথাও মনে করতে
পারছি না, সব যেন গোলমাল হয়ে
গেছে, তোমাকে সেদিন একটি ল্যাম্পপোস্টের
আলোর নীচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে
অবধি—কেননা
ঠিক সেই সময় আমি এক অপূর্ব সুন্দবী অভিনেত্রীর
জীবনচিত্র দেখে ফিরছিলাম, যে নাকি তার যশ, অর্থ এবং
যৌবন নিয়েও সুখী হতে পারেনি,—
অবশেষে ..........
এবং তোমাকে দেখে
মনে হলো, তুমি আমার যৌবন, অর্থ যশের
তলায় দাঁড়িয়ে আছো।

এবং আমি সেই অবধি ভাবছি, অনেক ভাবছি।

## শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

### তিন চরিত্র

১ ঘুম ভাঙতে বিমলার মুখটা মনে এল,
বর্ষার বিকেলে ঐ রাধাকৃষ্ণ সেজে ছেলে দুটি
হারমোনিয়মের তালে তাল রেখে জোরে হেঁটে যায়
তেমন বিস্ময় বড় স্মৃতির ভেতরে—
কেন মুখগুলি ভাঙা আয়নাতেই বিচিত্রিত হবে,
হাতে করে দোকানদার এঁকে রাখছে একশোখানা টিপ...
কোন্ দিক বেছে নেব, কোন্ হাওয়া, সমস্ত আমার
প্রত্যেক ভাষাই এত আকর্ষণ করে বারবার

হাওয়ায় এখনো ভাসছে বিমলার সেই কণ্ঠস্বর
চারিদিকে ওরই স্বাস্থ্য, ওর দর্প, তীব্র অহংকার!

২ বৈঠকখানায় দিনে বসবো না একাধিকবার
মহাপুরুষের কত পদধূলি জমেছে ওখানে
মাদুরে, শীতলপাটি চিত্রিত শিল্পের অবিকল,
গন্ধর্ববণিক কাল এসেছিল রসদ জোগাতে...
জানলার ওপারে রাস্তা, ভালুকওলারা বড় যায় না এখন
শিশুকালে ভালুকের পিঠে যারা চড়েছে সবাই খুব বীর
কাঠঠোকরার কাঠ এখনো কানের মধ্যে গাঢ় বেজে যায়
স্কুলের প্রার্থনাগীতি সেই এক সেই এক বাজে—
এত যে বানানো দুঃখ মানুষের...মন এক পুরো ধাপ্পাবাজ,
বড় অসুখের বড় তকমাধারী ডাক্তার এখনো
ব্যবসায় ব্যস্ত আছে, ঘুরে বেড়াবার ছুটি চাই—
ছাদেই বেড়াবো নিত্য বৈঠকখানাটা থেকে দূরে, বহুদূরে।

৩ প্রায় সব বৃদ্ধকেই ভীষণ সুন্দর মনে হয়
বারবার জেগে ওঠে বন্যযূথিকার সেই সুশুভ্র গভীর...
আমাদের কাঁঠাল-ছায়ায় এসে বসতো দুপুরে গরুবা
রোমন্থনে ফেনা দেখে সাবানে বুদ্বুদ তোলা পেঁপের কাঠিতে
রোজকার খেলা ছিল...ওরা সব প্রাকৃত এখন,
সমুদ্র কি সরে গেছে পাহাড় কি গলে হল জল...
বিশুকাকাদের বাড়ি গাছে গাছে পেকে থাকছে অযত্নের কত পাকা ফল,
নিয়মানুবর্তিতার কাল গেছে, সূর্য বড়ো ওঠে কি নিয়মে,
দেয়ালে আমার জন্যে চতুষ্কোণ ঐ ক্ষেত্র সযত্নরক্ষিত।

**মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত**

দৃশ্যের সর্বাঙ্গে : ২

দ্যাখো কী হীরক দ্যুতি সূর্যে
এবং আকাশ জুড়ে প্রতিভাস, তৃণ, শস্য
বৃক্ষলতা ছোট পাখি ঘাসফুল ইত্যাদিতে বিচিত্র বিস্ময়!

দৃশ্যের সর্বাঙ্গে দ্যাখো প্রতিদিন বিপুল আগ্রহে,
কেমন নিপুণ শিল্প, জন্ম প্রাণ আনন্দ ভৈরবী;
কী উজ্জ্বল রৌদ্র এলে জলস্থলে বিকিরিত হাসি।

ঐ দৃশ্যে ব্যঙ্গ নেই, জ্বালা নেই, যত খুসি হাত
রৌদ্রে রাখো, মনকে বিছিয়ে দাও পুড়বে নাকো ;
দৃশ্যের সর্বাঙ্গে দ্যাখো প্রতিদিন বিপুল আগ্রহে
তিলান্তরে বিকশিত, পুষ্পিত আনত

কেমন নিপুণ শিল্প ; ভালোবাসা যাব অন্যনাম ॥

**স্বদেশরঞ্জন দত্ত**

দুটি কবিতা

১ এত সুখ রাখবো কোথায়
বলে দে,
দুঃখ যদি সুখের চেয়ে অধিক,
আমায দুঃখ দিস কেন রে!

২· তুমি অন্ধকাবের শুভ্র ফেনা,
অন্ধকারেব মতই একাকার,
তুমি জ্যোৎস্না রাতের নির্জনতা
তুমি একলা বুকের হাহাকার।

**অনিরুদ্ধ কর**

পৌত্তলিককে

একবার দুবার কিংবা তিনবার তোমার দু-হাতের
মধ্য থেকে চলে যেতে পারে ট্রামের হাতল মুখ
উড়ন্ত আঁচল, যদি দৃষ্টান্ত বাড়াতে হয় তবে
যোগ করো সুখ স্বপ্ন মহিমার সান্ত্বনা শুশ্রূষা,

কিন্তু তারপর, মানে চতুর্থবারের সময়
অন্য একটা ট্রাম এসে, যাত্রীহীন চালকবিহীন
অন্য একটা ট্রাম এসে ঘণ্টার দুঃশব্দে বলে যাবে
পায়ে হেটে চলে যাও কুমারটুলীতে
সুখের স্বপ্নের মহিমার দীর্ঘ রূপসী পুতুল
সেখানে অপেক্ষা করছে স্বগীর্য় ধরনে।

### মহিমরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

#### একান্ত আপন কয়েকটি

১· যেন কাউকে তুলে দেবো দূবের গাড়িতে
পূর্বাহ্নে সবাই গেছে সম্মুখে নীলাভ লুব্ধতায়...
চৈত্রের ভোরেব বেলা লুপ্ত মগ্ন শীতল বিষাদে
চতুর্দিকের গাছপালার জন্মের নৈঃশব্দ্যে ডুবে আছি
সবুজ আদেশ তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে মহাদ্রুম
জনস্রোত বয়ে যায কোন মহাসমুদ্রেব দিকে।

কৈশোরের সকলেই চলে গেছে দূরের গাড়িতে
কেউ দুর্গাপুবে কেউ পরবাসী ভিলাই সিন্ধ্রীতে
কেউ ঊর্ধে আরো দূরে লোকান্তরে আত্মঘাতী হ'য়ে,.
ইস্কুলের মাঠে শুধু কোকিলের স্বর
প্রাচীন দুঃখের মত দোল খাচ্ছে ভুতুরে হাওয়ায়
যেন শেষ কেউ ছিল—তাকেও গাড়িতে তুলে দেবো
একলা আজ বসে আছি ডুব দিয়ে চৈত্রের বিষাদে...
সবুজ আদেশ তুলে মহাদ্রুম দাঁড়িয়ে রয়েছে।

২· বাড়ির বাহিরে এলে গাছপালা . গাছপালা...স্মৃতি...
অন্ধকারে স্নাত পাতা খুলে দেয় অবণ্য প্রাচীন
মনে পড়ে শিরীষের গন্ধে হেঁটে সকালে ইস্কুল
পাহাড়ে দুরন্ত বৃষ্টি—তারপরে ঝর্ণা কিছুক্ষণ

পিতামহ অধ্যুষিত গ্রামের বুকের গর্তে জল......
অনুগত দিন...স্নিগ্ধ ভালবাসা...সহিষ্ণু মমতা...
আরো দূরে আরো দূরে কবেকার তন্ময় হরিণ
পা গুটিয়ে শুয়ে আছে মুখ রেখে সিংহের কেশরে

ঘরের ভিতরে হিংসা...উন্মোচিত সমস্ত আয়ুধ...
বাড়ির বাহিরে এলে সহিষ্ণু স্মৃতির গাছপালা।

**অমিতাভ দাশগুপ্ত**

কলকাতার সুবোধ জলপাইগুড়িতে

১। ট্রেনে

জনাকীর্ণ নগরেতে সবচেয়ে নির্জনতা আছে।
গুঁড়ো এলাচের মত ছোট হয়ে যাচ্ছে সব স্মৃতির বেণুকা
লোহার বিকীর্ণ জংঘা পিস্টনের উদ্যত চিবুক
কামদার ক্রোধে ছুঁয়ে যাচ্ছে; আমি অন্তরে বাহিরে
খাঁচায় পোষানো রাত-চরা ডাঁশ বাংকে হিংটিং
স্বপ্ন দেখছি ভেঙে যাচ্ছে স্বপ্ন দেখছি ভেঙে যাচ্ছে স্বপ্ন
বাইরে রাত্রির অজস্র ঋতুস্রাব, দেখছি ভেঙে যাচ্ছে দেখছি :
আমি যেন কোনদিন বাড়ীঘর ছেড়েছি ইস্কুল
কাহার উজ্জ্বল সুখ কাহার কোমল বুক ভেঙে
যেন সদাগর-পুত্র, গর্জমান পথ-উপকূলে
প্রবল তৃষ্ণায় হেঁটে, গ্রাম-গঞ্জ পেরিয়ে এখানে
আবার পেয়েছি খুঁজে··ধুত্তোর, নীচের সিটে একটি মানবক
পেল্লায় চ্যাঁচাচ্ছে, অরে মাতৃক্রোড়ে রতনের রাজি
তোর মা কি দেবগাভী সুরভি যে দিবারাত্র বাঁট...
ফের চুলছি ফের স্খলিতাংগ স্বপ্ন মধ্যবয়সী কুটিলাগ্রস্তনী স্বাস্থ্যল নারীর
অপার সংহত দেহে মহোল্লাসে ডুবে যাচ্ছি যাবো
আমার গোলাপ-বালা, আমি, আর চুম্বনের মতো
মাঝে তপ্ত অন্ধকার—বাকি সব তরংগে ডোবাবো।

২· লং শটে

লালবলের টিকলি-আঁটা সকাল আরেকটু পরে জলপাইগুড়ি।
আমি খাস কলকাতার অন্তর্পাতী শাঁখারিটোলার
সুবোধ, বেকার থাকতে বাড়ীর ফরমাস খেটেখেটে জেরবার
হঠাৎ দুরুম করে বে করে তো মহাকেলেংকারী
বৌটারও বাচ্চা হবে, তবু একটা সামান্য চাকরী
জোটাতে পারছি না; জেঠু ছোটকাকা কত্তামা বড়দি
পলতে আঁটা বমশেল, কি ভাগ্য যে মরি নাই, এমন সময়ে
অকস্মাৎ শিকে ছিঁড়তে অগত্যা সুবোধ আমি জলপাইগুড়ি

৩· ক্লোস আপ

দুয়াবে অশবখুবেব শব্দ, বুকে দোলা দিতে মুক্তাহার
জীবনের বিবি বলল: থামো না জীবিকা বলল, চলি
বেরিয়ে এলুম মনিহাবী হয়ে সর্কারিগলি

বুক কলজে ছিঁড়ে টলছে কৃষ্ণচূড়া। সদ্য পরিচিত
সুরজিৎ বলতে পারে ইস্টিশান রোডে কবে কৃষ্ণচূড়া ফোটে।
ওআইদার 'কানাল' দেখে হল থেকে ছটকে আসা বিমূঢ় যুবক
পাড়ায় আড্ডায় দম ফেলে বলেছিল · বাব্বা মরা মরা মরা
দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল না আমরা কেউ বেঁচে আছি।
ধোঁয়াশার ছিপি-আঁটা কলকাতার কলংকী বাতাস
যেমন নতুন প্রেমে যুবাটিকে সাপটে ধরেছিল

তেমনি প্রথমে
রিক্সার বিস্মিত হর্ণ কলজে ফাটা কৃষ্ণচূড়া সদ্য পরিচিত।
ইস্টিশান সাক্ষী দেবে, জলপাইগুড়ি বড্ডো ভাল লেগেছিল।

কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়ায় আমার ভালবাসা
খোড়ো ঘরের জান্লা দিযে টপকে দেখা দুপুর
হর্স-সু বাঁধে মানানোসই জোড়ায় কাঁপা বিকেল
নীলরাঙানো বাটির মতো গিলতে আসা আকাশ
নদীর চড়ায় আদ্দি কালের ধুখুরে ট্যাক্সি
ভীষণ ভালো লেগেছিল আমার, বউয়ের, খুকুর
যেন আর একটু ভাল লাগায় জালে ধরা তিনটে মাকড়সা

৪· ফেড ইন-এ

অক্ষয়কবচ বোর্‌ড্‌ হওয়া, কিস্যু ভাল না লাগার অভিশাপ
প্যান্টের প্রথায় এ'টে জন্মেছি আমরা কলকাতার সুবোধ;
নির্ভুল নিশানা সামনে, আস্তাবলে সময়ের অশ্বের-পুরীষে বন্ধপদ
দণ্ডিতের প্রায় দাঁড়িয়ে রয়েছি, উদ্যত ট্রিগার তৈরী ডাইনে বায়ে সম্মুখে পেছনে
কাঁটাতার বেয়ে পূর্বপুরুষের রক্ত ঝরছে—এবার আমরা।
আহত শোণিতে সব দৃশ্যাবলী ধুয়ে যাচ্ছে, অন্ধ সাইক্লপ্‌স্‌
দারাপুত্রপরিবার সমবেত বন্ধুবর্গ কাউকে চিনছে না
হে পুত্র ফিরিয়া চাও অভিমানী দুর্যোধন পাত্র মিত্র সভা-পরিষদে
বুক ঝমঝম করত, সব চোখখাকী ভালোবাসা
ইতর চোযালে চিবিয়েছে। আজ ইস্টিশান রোড বেয়ে পেছনে তাকাতে
ভয় পাই। ডাইনীর রোষে গোড়ালির ধুলো চাটছে উন্মাদ কুকুর।
অথচ সমস্ত পাবে এখানে, জলপাইগুড়ি মিনিএচর স্কেলে কলকাতা
উদ্যত শাটাবে ধরে রাখছি যতটুকু পারি এঘাটের প্রেম
অতঃপর কলকাতায় খুবলে নেয়া কোন এক ত্রস্ত অবকাশে
তার ছবি মেলে ধরব, যারে আমি রাখিয়া এলেম।

## শান্তি লাহিড়ী

### এই রাত্রি ঃ ঘুম নেই

সারা নিশীথ ধূপ ছিটোলেম ধূপদানিতে
ক্রমে ক্রমে স্তূপাকৃতি বোঝা হল,
জল ছিটোলেম কাগজের ওই ফুলদানিতে
পাপড়িগুলো রং উঠে সব বোঝা হল।
বৃষ্টি অবুঝ, অঝোরে তার অশ্রুধারায়
দরজা খুলে, সমস্ত রাত কেউ এলো না,
যমাকৃতি ঝুপসি-কদম সৃষ্টি ছাড়ায়,
ছড়ায় মাঠে। মাঠের পথে কেউ এলো না।

দাঁড়িয়ে ছিলেম মাঠের আলে সন্ধ্যেবেলা
চাঁদ উঠেছে কখন যেন, চোখ মেলিনি,

পায়ের কাছে নূপুরগুলো করছে খেলা
শব্দে আমি অবাক হয়ে চোখ মেলিনি!
কেয়াবনের কাঁটায় আমি আহত রে
ফুলের কথা হঠাৎ কখন ভুলেই গেছি
এখন ক্ষতের রক্তে ভীষণ সকাতরে
রাঙাকেয়ার পাপড়ি হঠাৎ তুলতে গেছি।

বাইরে সেদিন আকাশ ছিলো কৃষ্ণকলি!
হাওয়া খেলেম বিভোর হয়ে স্মৃতিচারণ—
বন্ধু ক'জন—গুনতে গিয়ে কেবল জ্বলি—
আগুন হল, কুয়াশা সব স্মৃতিচারণ!
এখন আমি ঘাটশিলা কি কার্শিয়াং-এ
কোথাও যেতে পারিনে, এই মায়া-কানন
এখন আমার চতুর্দিকের চতুব রঙে;
চারদেয়ালের আকাশ বানায় মায়াকানন।

এবার ফিরি ঘরের মধ্যে কবরখানায়
কবে আমি মরে গেছি আঠারোতে,
চেষ্টা নিলাম ভর করে ফের হাল্কা ডানায়
মৃত আমি পেঁছে গেলাম আঠারোতে।
ভালোবাসায় বাঙা হয়ে আরশিখানা
তুলে আমি মুখের কাছে—মুখে আমার
কোথায় কিশোর! পালক ছেঁড়া ভাঙা ডানা—
নিরাশ্বাসেব ছোট্ট চড়ুই মুখে আমাব।

ছুটে গেলাম দেয়ালে নীল চিত্রলেখায়,
ভেবেছিলেম সাগর বুঝি ঘরের কাছে,
টুকরো হয়ে কাঁচগুলো সব কেমন দেখায়
বিঁধে থাকা। সমুদ্র কার ঘরের কাছে?
এবার আমি বুকের কাছে গিয়ে দাঁড়াই
নিরভিমান ভালোবাসার সহস্রদল।
ভালোবাসা, একে একে দুহাত বাড়াই—
নিরভিমান, বুকের কাছে সহস্রদল।

নমিতা বসু মজুমদার

## রবীন্দ্রনাথ, আমি ও আমরা

জানি তুমি কখনো বিমর্ষতার চর্চা করোনি
আর আমি তোমার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে
সেই প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম।
অনেক আশা ছিল আমার, অনেক সাধ।
হিমালয়ের শ্বেতচূড়ায় চড়ব
ডুব দেব সমুদ্র-গভীর-অবগাহনে
নীল আকাশের কোলে সোনালী রেখায়
রেখে যাব আমার হৃদয়-পদ্মটিকে।

অথচ আমার কাল,
বিলাসী, নির্লজ্জ কাল আমার
লঘু আরামের নেশায় মেতে,—
উপুড় হয়ে পড়ল পেয়ালা
ছড়িয়ে ছিটিয়ে
নিঃশেষ মধু।

অনেক আশা ছিল আমার, অনেক সাধ।
ভেবেছিলাম দেখে যাব
মানুষের সঙ্গে মানুষের
গভীর এক নিবিড় প্রত্যয়।

অথচ আমার কাল
নিষ্ঠুর, কঠিন কাল আমার
ক্রুর অন্ধ, গোঁগোঁ রাগে
লাথি ছুঁড়ছে—

উপুড় হয়ে পড়লাম আমি, আমার বন্ধুরা
আমার দেশের, আমার কালের মানুষ
আর আমাদের সমবেত হৃদয়
অগাধ যন্ত্রণার পাক বেয়ে বেয়ে
অনেক কান্না কাঁদল।

জানি তুমি কখনো বিমর্ষতার চর্চা করোনি
কিন্তু, আমি, আমরা
অগাধ যন্ত্রণাব পাকদণ্ডীপাকে
অনেক কান্নার মোড়কে
জড়িয়ে পড়লাম।

**পরিমল চক্রবর্তী**

### প্রেম ও অপ্রেম

ফিবে এসো, ফিরে এসো, সোনালিয়া, সুদূরের বাঁকে
হারিয়ে যেও না আর। আমার চোখের শান্ত হ্রদে
কতো জল, একবার চেয়ে দ্যাখো মনোমিতা। তুমি
এবার অপ্রেম থেকে চিরতরে প্রেমে ফিরে এসে
আমাকে ঘনিষ্ঠ করে তোমার হৃদয়ে নাও; যাকে
এতোকাল যন্ত্রণার কারাগারে বন্দী করে তুমি
সুখী ছিলে, এইবার সুনিবিড়ে তাকে ভালোবেসে
মুক্তি দাও, থামো তার মনের উঠোনে ভীরু পায়ে॥

আমাকে প্রেমের থেকে অপ্রেমেব হাতে সঁপে দাও
এইবার, সেনালিয়া; 'এজেলিয়া' ফুলের মতন
হৃদয়ে সৌরভ ছিলো যতো, এইবার মুছে নাও
তোমার হৃদয়ে। আমি দুঃখের পাতালে নেমে, মন
কান্নায় প্রমুগ্ধ করি। তারপর আকাশের চোখে
চোখ রেখে, মন রেখে সমুদ্রের অতল গভীরে—
প্রেমেব প্রগাঢ় ছবি মুছে ফেলে, অনিরুদ্ধ শোকে
একা একা বিস্মৃতির একক আশ্রয়ে ফিরে যাই॥

## বিজয়কুমার দত্ত

### ত্রিতাপ দুঃখের স্মৃতি

১· সব কিছু বদলে যায়—শহর মানুষজন লোকালয় পথের চেহারা,
নাকি সবই ঠিক থাকে? আসলে চোখের মণি ক্ষয়ে যায় রোজ
রজনীগন্ধার ঝাড়, বেলকুঁড়ি ঝরানো বকুল
তেমন বিহ্বল সাদা দেখায় না আর।
জানি এ সংসার তীক্ষ্ণ অস্ত্রের ফলায়
কেবলি আঘাতে মূঢ় করে দেয় স্বপ্নের শরীর
প্রাক্তন বিশ্বাসবিক্ত প্রণয়ের নরম শয্যায়
হাওয়া আজ ভাবী লাগে অমল সন্ধ্যায়।
বুকে কোন রক্ত নেই অস্থি মাংস নিহিত শরীরে
সারারাত জেগে থাকা নিশ্চল প্রতীক্ষা মগ্ন অন্ধকার ঘিরে।

২· জ্বর গায়ে বাড়ী আসে অফিস ফেরত এক কেরাণী যুবক—
সোমবার অপরাহ্ণঃ ডালহৌসী স্কোয়ারের বুকে
তখন উত্তাল ধ্বনি ট্রাম বাস অঢেল মানুষ
যেন এক বাঁধভাঙা স্রোত, হঠাৎ প্লাবিত করে
শহর বাতাস এই বিকেল পাঁচটায়,
তখন সে যুবকের ক্ষীণম্লান জ্বরতপ্ত বিষণ্ণ স্মরণে
মনে পড়ে ছেলেবেলা, উজ্জ্বল চকিত তীক্ষ্ণ অধীর কৈশোর
রমনী উত্তাপ গাঢ় উদ্দাম জীবন।

সেদিন সমস্ত রাত ঘুমহারা অস্থির কান্নায়
জীবনে প্রথম তার মনে হল এ পৃথিবী নিশ্চল হৃদয়
বিকীর্ণ আঁধারে ঢাকা করুণ সময়।

৩· মনে কোন অভিমান রাখিনাকো। কেন না সংসারে
সাজানো সুখের চিহ্ন ভেঙে যায় কাঁচের মতন—
জীবনে কোথায় ছিল আলোকিত রূপের জোয়ারে
মাধুরীর নীলাভ কম্পন। অভিমানে অবগাঢ় মন

কেবলি হারায় আজ রক্তের উন্মুখ স্বর, সানন্দিত গান,
রমনী-সঙ্গীত-শিল্প যৌবনের অমেয় সম্মান।

আমরা অনেকদিন পৃথিবীতে রয়েছি নীরবে
যুদ্ধের বীভৎস শোকে, শান্তির বিনীত পরাজয়ে
সচকিত ভগ্নকণ্ঠ। কতবার নিহত দলিত পিস্ট মানুষের শবে
বুকের বিকীর্ণ ক্ষত ভরে গেল সুমিত হৃদয়ে।

মনে কোন অভিমান ছিল কি ছিল না এতদিন
সময়ের বাঁকা রোদে ভেসে যায় পিপাসার্ত প্রেম রক্তহীন।

### অমর ষড়ংগী

#### স্বীকারোক্তি

আমি অপবাধী আমায় কোরোনা ক্ষমা।
আমি মূঢ়, আমি শয়তান, পলাতক
দেখো না ঐ মুখ, কোনদিন আর এর ছায়া মাড়িয়ো না
সকলই সইবো জীবনের ভুল যতই দুঃখ হোক্।

একাত্মতায় ভালোবেসেছিল অদেয় রাখোনি কিছু
আবেশিত হাসি, উচ্ছল মন ইন্দ্রিয় সুখ তাও,
গোপন হৃদয় স্পর্শ কবেও পাওনি অন্য কিছু
আমাকেই দিলে দু'হাতে উপড়ে নিজেব জীবনটাও।

আমি অপরাধী আমাব নেইকো ক্ষমা
গায়ে নিয়ে এক মিথ্যের নামাবলী
তোমার সঙ্গে রৈখিক প্রতারণা
করেছি ভেবেছো, কি করে শোনাবো মনের পত্রাবলী।

করবে না জানি বিশ্বাস তুমি আর।
সমুদ্র স্বাদ কল্পিত নয় জানো,
কিভাবে দেখাবো আমার স্বপ্ন নিয়ে
তোমাতেই আছি। নিবিড় রাতের গানও

যদিও তোমার প্রেমের যোগ্য নই
আকাশ-মাটিতে কঠিন অঙ্গীকার
দৃঢ়তা আমার স্থায়ী হল না তো কই
পরাজয় মানি, বঞ্চিত অধিকার।

ক্ষতবিক্ষত অবসাদ মেশা দিন
আত্মার গ্লানি, আমার নেই তো সুখ
বিষাদ জীবন শূন্য, দীর্ণ হীন,
অপরাধী আমি নিজের দু'হাতে ঢাকবো আমার মুখ।

আমি অপরাধী আমায় কোরোনা ক্ষমা।

**বাসুদেব দেব**

### তিস্তা তীর-বাসী-কে

তিস্তা প্রিয়সখী, সহসা মেঘডম্বরুতে ব্যাকুল
উতল হলো। পাহাড় দ্যাখো ঢাকলো কালো মেঘে।
জানালা বন্ধ করো যুবক। ঘর ভিজবে। ফুল
গন্ধরাজ ভিজবে বুকের তলায় বৃষ্টি লেগে॥

তিস্তা প্রিয়সখী, ভাঙবে এখন, ডাকবো গাঢ়স্বরে—
ঘাঘবা দুলবে, ঢেউ ছড়াবে। আকাশ মগ্ন পোত।
যুবক তোমার উঠোন ভেজে অন্ধকার ঘরে
ভাঙন-ভীরু অবক্ষয়ের প্রবহমান স্রোত॥

**রথীন মুখোপাধ্যায়**

## অন্দর নির্জন

তোমার রক্তে কোনো সোচ্চার নেই। তোমার শিয়রে
বাদামী আলোর নীল বিস্ফোরণ, হাওয়া
দিলে বিবর্তন অশরীরি প্রচুব ক্ষমতা।
প্রসবিনী, শরীর তুলোর রোগা স্বাভাবিক সাদা বিবৃতিতে
একদিন ছিল। হাওয়া দিলে
চোয়ালের বিশিষ্টতা অজস্র পথের নির্মম
ঋজু ভেঙে সগর্বিত সুডৌল গালের প্রত্যাশা
হয়ে যেতো। প্রসবিনী, তোমার শিয়রে
এক স্তূপ বরাবর পরিণতি-হীন কান্না, মাংসল আওয়াজ
অন্দর নির্জন কোনো সৃষ্টির মাধ্যমে
একটা গোটা দেশের বিক্রম
জ্বালায় সর্বত্র আজ।

প্রসবিনী, যেন
তোমার রক্তে আজ ছোট বড় স্তরেব মতন
শান্তির প্রত্যয়, ঢেউ খুঁজে চলে কোনো আলোড়ন।

**বরুণ মজুমদার**

## হে জলধি স্থিব থেকো

হে জলধি, স্থির থেকো নিশ্চিত গহনে।
তোমাব দর্পণে আজ মুখ দেখে যাবো,—
এই বলে সারাদিন শুধু বসে আছি,
পরিচিত সময়ের জলঘড়ি মেপে।

পিপাসার জল দেবে প্রতিশ্রুত ছিলে,
তোমাকে রেখেছি তাই মনের কোণায়।
যদিও আমার দৃষ্টি প্রসারিত নয়,
তবু আজো স্বপ্ন দেখি শোকাহত ছবি।

হে জলধি স্থির থেকো সকল সময়।
আমি এই জীবনের তরী বেয়ে শুধু
চলে যাবো অন্ধকারে অতি সাবধানে,
নরকের ভয়ঙ্কর ছবি মনে রেখে।

আমি তবু কোনদিন করুণা চাই না,
কোন ঘৃণ্য নারীমূর্তি দেখতে চাইনি,-
যা থেকে অন্ততঃ এই সমস্ত শরীর
যন্ত্রণার বন্ধ হ্রদে ডুবে যেতে পারে।

**কালীকৃষ্ণ গুহ**

দিলীপকুমার সেনের জন্য একটি সনেট

অথচ কোনদিন তোমাকে ভুলে যাওয়া হবে না।
এখন আত্মাব কাছে উষ্ণ বিশ্রাম চাই। পৃথিবী
কারুর নয়, পৃথিবী আমাদের সকলের। প্রশ্ন
তবুও মনে জাগে ঃ কৃষ্ণচূড়ার গাছ সর্বত্রই
তো আছে। শবযাত্রার ধ্বনি সর্বদাই কানে আসে।
বহুদিনের পুরোনো রোদ্দুর বুকে কবে এখানে
কারা আসে? নক্ষত্রের নীল আলো একটু একটু
করে জমিয়ে জমিয়ে অতঃপর আমি শব হবো।

তুমি দীর্ঘ দিন রাত্রি জেগে জেগে কবিতা লিখেছো
নিস্তব্ধ রাত্রে তুমি যে সব শব্দ শুনেছ, যে সব
উদ্ভিদের পদশব্দ, অন্ধকারে ঘর্ষণের শব্দ,
প্রত্যাশিত আলোর শব্দ, সে সবই আজ তোমার।

আমরা চিরদিন সূর্যকে বিশ্বাস করে এসেছি
এবং বিশ্বাসই আমাদের প্রেম, আমাদের মৃত্যু...

## তারাপদ রায়

### একটি অপ্রাকৃত দৃশ্যকাব্য: প্রিয়বালা মহেন্দ্র ও জনৈক শ্মশানবন্ধুর কথা

**পাত্রপাত্রী**

প্রিয়বালা—জনৈকা ব্যভিচারিণী, মহেন্দ্রের স্ত্রী এবং হন্তা।
মহেন্দ্র—৬ই ফাল্গুন, ১৩৬৭ রাত্রিকালে নিহত জনৈক যুবক; প্রিয়বালার স্বামী।
শ্মশানবন্ধু—প্রিয়বালার প্রেমিক, মহেন্দ্রের বন্ধু, শ্মশানবন্ধু এবং অন্যতম হত্যাকারী।

সময়—৯ই ফাল্গুন, ১৩৬৭ সন্ধ্যাবেলা, কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া কি তৃতীয়া তিথি।

**পটভূমিকা**

মফঃস্বলের এক প্রান্তে কোনো এক সাবেক কালের পুরানো দোতলা বাড়ি; কাঠের বারান্দা, সিঁড়ি। এদিকে ওদিকে অস্পষ্ট ঝোপঝাড়। একতলায় দক্ষিণ দিকের বারান্দায় একটা কেরোসিন লণ্ঠনের আলো জ্বলছে। সেই ম্রিয়মান আলোয় সমস্ত কিছু কেমন যেন অস্পষ্ট, অপ্রাকৃত। চারিদিক ফাঁকা নিস্তব্ধ, বারান্দার নীচে দুএকটা শীত শেষের অকাল মরসুমী ফুল নিষ্কম্প এবং প্রায় অস্তিত্বহীন।

দৃশ্য উঠলে, প্রিয়বালা এবং তার প্রেমিককে দেখা গেলো। অবশ্য প্রিয়বালাকে ঠিক দেখা যাচ্ছে না; অসম্বদ্ধ কেশভার একটি ক্লান্ত নারীদেহকে অনুমান করা যাচ্ছে। সে প্রায় অন্ধকারে শরীর এলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে এলোমেলো করে জড়ানো ছাই রঙের আলোয়ান, শিথিল কোঁচকানো শাড়ি। প্রিয়বালা যেন কোনো দিকে না তাকিয়ে চোখ খুলে রেখেছে। প্রিয়বালার প্রেমিক সেও কেমন ক্লান্ত তথাপি তার দাঁড়ানোর মধ্যে একটা ঋজুতার আভাস মিলছে। লণ্ঠনের আলো এসে তার মুখে চোখে কপালে পড়েছে। সে স্থির দৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে প্রিয়বালার শরীরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, কপালে কুঞ্চিত ভ্রু ক্ষুধার্ত মাকড়শার মত স্থির।

দৃশ্য ওঠার পর থেকেই দৃশ্যের অন্তরালে একটা অনুপস্থিত চঞ্চলতা যেন অনুভব করা যাচ্ছে। কারোর পায়ে চলার শব্দ কিম্বা অন্য কিছু একটা খসখস আওয়াজ অন্ধকারের ভেতর থেকে উঠে আসছে। লণ্ঠনের শিখাটা একটু একটু করে কাঁপছে, পায়ের শব্দটা যেন একটু স্পষ্ট, স্পষ্টতর হয়ে উঠলো। প্রিয়বালা এবং মহেন্দ্রের মধ্যে অন্ধকার, লণ্ঠন নিভে গেছে, সেই অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা ছায়া উঠে এলো।

#### শ্মশানবন্ধুর কথা

উত্তরের বারান্দায় কাঠের সিঁড়িতে কারা হাঁটে
ও ঘরেতো কেউ নেই, মহেন্দ্রের ঘরে আজকাল
কেউই থাকেনা জানি। তবু ওই হলুদ দেয়াল
এ কার ছায়ায় কাঁপে বারবার, কার ছায়া জানালায় কপাটে ?
মহেন্দ্র কি এ বাড়িতে, ওই ঘরে এখনো রয়েছে
সেতো আর বেঁচে নেই, নাকি এই বাঁচা না বাঁচার
কোনো গূঢ় অর্থ নেই জীবনের সমস্ত রেখার
কোনো খানে সীমা টেনে বলতে পারি না,
এর পরে সব মুছে গেছে।

মহেন্দ্র, এখন তুমি আর বেঁচে নও; ম্লান আয়নায়
ওই ধুলো জমা কাচে তুমি আর নিজের ছায়াকে
কোনোদিন খুঁজেও পাবে না, শোনো, মহেন্দ্র তোমাকে
পরশুরাতে ডোম্‌নার শ্মশানে রেখে এলাম চিতায়।
তুমি কেন ফিরে এলে, এই ঘর দেয়াল-জানালা
তরুলতা, বিহঙ্গম-বিহঙ্গমা, প্রিয়তমা নারী
সে আর তোমার নয়, এই শান্ত ছায়াময় বাড়ি
তুমি আজ বহুদূর দূরতম নিঃসঙ্গ নিরালা।
হে মৃত যুবক, শোনো, আমি সেই অব্যর্থ প্রেমিক
যে পারে ছিনিয়ে নিতে বরমাল্য, গৃহসুখ নারীর শরীর
আমি সেই দুঃসাহসী, আমি সেই হত্যাকারী বন্ধুতা স্মৃতির—
সব মূল্য এক পণ্যে দিয়েছি বিকিয়ে,
তবু তুমি ফিরে এলে ঠিক।
অমল জোনাকিপুঞ্জ, দ্যাখো, কুয়াশার অন্ধকারে
আর কোনোদিন তুমি শীত গ্রীষ্ম তৃষ্ণায় ইচ্ছায়
আশ্রয় পাবে না খুঁজে, ডোমনার ঘাটের চিতায়
সব ইচ্ছা ছাই হয়ে ধোঁয়া হয়ে ভেসেছে জোয়ারে॥

### প্রিয়বালার কথা

জানিনা রক্তের নীচে ফণীমনসার কাঁটাবন
আছে কিনা; নাকি এই শিরায় শোণিতে জ্বালাধরা
এই দেহ তীক্ষ্ণ বিষ, তীক্ষ্ণ, তীব্র ব্যর্থতায় ভরা
আরেক মনসাগুল্ম, ব্যর্থ দুঃখে জ্বালালো যৌবন।

মহেন্দ্র, আমাকে তুমি বহু সুখ সুখ দিয়েছিলে
এই শান্ত গৃহকোণ, এই স্তব্ধ পাদপের ছায়া,
অঙ্গনের পুষ্পগুচ্ছে মাধবীর পল্লবিত মায়া,
সংসারে যা কিছু প্রাপ্য, হাতভরে তুলে দিয়েছিলে।

বিরঞ্জন শান্ত ঊষা মধ্যাহ্নের অস্ফুট গুঞ্জন,
চন্দ্রাবলী স্থির সন্ধ্যা, মেঘপুঞ্জে, নক্ষত্র বল্লরী;
তুমি সব দিয়েছিলে সুখ নম্র দিবস-শর্বরী,
সব আলো, ভালবাসা, প্রীতি গাঢ় ঘন আলিঙ্গন॥

তবুও কোথায় রক্তে কোন্ এক নিবিড় যন্ত্রণা
আমার আত্মাকে হত্যা করে ক্রূর আদিম উল্লাস
এই দীর্ঘ যৌবনের প্রতি দিনে, প্রতি মাসে মাসে
নিষ্ঠুর কৌতুক সেই সর্বনাশা; তুমি তাকে কখনো জান না।

মাধবীর এই ফুল, এই দুটি প্রিয় চোখ বাদে
কিছুই রাখোনি চোখে, ভাবোনি তোমার প্রিয় গান
আরো কারো প্রিয়তর, এই ভালবাসার সম্মান
পরিণত হতে পারে কোনদিন অলীক প্রবাদে।

হে নিহত, যে বিষ তোমাব অন্ত্রে, নীলাক্ত শরীরে
আমি তাকে সে যন্ত্রণা রক্তে-রক্তে দীর্ঘদিন জানি,
জানি মৃত্যু, পলে পলে জ্বলে যাওয়া দেহের যন্ত্রণা, আমি জানি
শিরায়—শোণিতে—রক্তে, অন্ধকারে, গভীর তিমিরে।

অন্ধকার, চতুর্দিকে সঞ্চাবিত শূন্য অন্ধকার;
ও ঘরে সমস্ত আলো নিভিয়ে দিয়েছি, বারান্দায়
ফুলদানিতে কোনো ফুল রাখিনি গুছিয়ে। এ কোথায়
ফিরলে তুমি? নাকি মৃত্যু নেই এ ইচ্ছার, কামনার?

### মহেন্দ্রেব কথা

মাধবী বিপিন বাসী প্রিয়তম পাখীটির গান
জ্যোৎস্না কালে শোনা যাবে, ততক্ষণ এই নিমগন্ধ অন্ধকার,
পায়ের তলায় শাদা নিমফুল; একদা তোমার
শরীরের কোন অংশে এই গন্ধ তীব্র বহমান?

বাসক পুঞ্জের সজ্জা, পথের দুপাশে দ্রোণ ফুল,
শীতের ধূসর রঙ অপরাহ্ন অস্পষ্ট আকাশে;
এখনো কি বেঁচে আছি? মজা সড়কের দুই পাশে
এখনো'ত জমে আছে দূরতম বসন্তের প্রথম বকুল।

প্রিয়বালা, তুমি বিষ দিয়েছিলে, তবু বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে,
ডোবায় কলমিলতা, মৌরলা মাছের খেলা ঝকঝকে জলে,
সাধের মাধবী যেন কে ফোটায় আগাছায় বৈঁচির জঙ্গলে,
প্রিয়কণ্ঠ পাখী ডাকে চন্দ্রযাম তৃতীয় প্রহরে।

আরো সমর্থন আছে, তুমি শুধু বাঁচতে দিলে না,
এই আলো ছায়াময় নিবিড় গভীর পৃথিবীর
ধুলোয়—হাওয়ায়—রোদে প্রতিদিন ইচ্ছার শরীর
কি আশ্রয় খুঁজেছিলো, কেউ তাকে কখনো জানে না।

প্রিয়বালা, একদা কৈশোরে তুমি বেনারসী শাড়ীর শিহরে,
চন্দন তিলক ভালে লাজরক্ত প্রথম সিন্দুরে
থর থর কেঁপেছিলে, দিন তাকে নিয়ে গেছে দূরে
সন্নিকট ছিলে তবু স্মৃতি, প্রেম স্বপ্নময় ঘরে।

আরেকবার তুমি সেই নীলেশ্বর শিবের পার্বনে,
কি যেন কিনতে গিয়ে হঠাৎ ভীড়ের মাঝে উজ্জ্বল মেলায়
কোথায় হারিয়ে গেলে, খুঁজে পাওযা ধূসর সন্ধ্যায়
তোমার সন্ত্রস্ত দৃষ্টি, প্রিয়বালা, সব আছে মনে।

এক বিন্দু জল দিয়ো, এইখানে এই বিল্বপাদপের মূলে
একটি মাধবীলতা বুনে রেখো, মাধবীর শুভ্র নীরবতা
আমাকে থাকুক ঘিরে আর তুমি নিষ্ঠুর মমতা
আমাকে প্লাবিত করো, আর এই জানলা রেখো খুলে।

সন্ধ্যার আকাশ বড় প্রিয় ছিলো, গোধূলির একটি দুটি তারা
জানালা কম্পিত মেঘ, মেঘে বড় সুখ ছিলো, আমার মৃত্যুকে
তুমি বুঝি কোনোদিন বুঝতে পারবে না, কত দুঃখে
চতুর্দিকে ঘুরছে ফিরছে জীবনের চঞ্চল ইশারা।

দ্যাখো ইচ্ছা আজো বেঁচে, জানি আর কোনো অনুভবে
কোনো স্পর্শ, কোনো শব্দ, কোনো আলিঙ্গনে—
তার কোনো তৃপ্তি নেই
তবু তুমি জল দিয়ো, ফুল দিয়ো আর শোনো সেই
জানালাটা খুলে রেখো—আজ কিংবা কাল মেঘ হবে।

# শিল্পসাহিত্য প্রসঙ্গ

## বিবেকানন্দ ও বাংলা চলিত গদ্য

উনিশ শতকেব শেষার্ধ আন্তর্জাতিক দৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদের পর্ব। সাম্রাজ্যবাদ তখন শাসনের ঔদ্ধত্য ও শোষণের নৃশংসতা নিয়ে যেমন প্রকাশিত হচ্ছিল, তেমনি নিপীড়িত দেশ ও শোষিত জাতির মধ্যে জাগিয়ে তুলছিল জাতীয় চেতনা—জাতীয় আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রাথমিক প্রয়াস। ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলা দেশে, প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল ইতিহাসের এই দ্বৈতরূপ। ইং ১৮৫৮ এর পব হতেই বাঙালীর জীবন আধুনিক যুগের প্রস্তুতি পর্ব ছাড়িয়ে প্রকাশের পর্বে উত্তীর্ন হোল, আর ঠিক এই পর্বেব প্রথমভাগেই (ইং ১৮৬৩) স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম। বিবেকানন্দের জন্মলগ্ন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্মলগ্ন। তাঁর বাল্য ও কৈশোর মধুসূদন-বঙ্কিমের প্রতিভার প্রকাশে উজ্জ্বল, যৌবন রবীন্দ্রনাথের নবীন আলোকচ্ছটায় প্রদীপ্ত।

বিবেকানন্দ ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক—এক মহা বিপ্লবী সন্ন্যাসী, সাহিত্যিক নন। কিন্তু বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে, যাঁবা মুখ্যত সাহিত্যিক নন, তাঁরাও অনেক ক্ষেত্রে ভাষা-শিল্পেব রূপান্তর ঘটিয়েছেন তাঁদের বলিষ্ঠ চিন্তায় ও প্রখর ব্যক্তিত্বে। ইংরেজী ভাষায় বার্ক, ফরাসী ভাষায় ভল্‌তেযাব আব বাংলাতে রাজা রামমোহনেব মত স্বামী বিবেকানন্দও এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্বামীজী এক গভীর সমাজ চেতনা ও এক মহান ধর্মাদর্শ নিয়ে এসেছিলেন। তাই তাঁব ভাষা ছিল প্রচারধর্মী। সেখানে সাহিত্য-তপস্বীর অনুশীলন যতখানি ছিল, তার অধিক ছিল এক মানবপ্রেমিক কর্মীর প্রাণচঞ্চল আবেগ। এই পশ্চাৎপটের আলোকেই একমাত্র বিবেকানন্দের ভাষারীতির আলোচনা সম্ভব।

হাজার বছর ধরে বাংলা কবিতা রচিত হয়ে এলেও বাংলা গদ্য-রচনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সামগ্রী। বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠক মাত্রেই জানেন যে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজকে কেন্দ্র করে উইলিয়ম কেরী উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের ভিত্তিস্থাপন করেন এবং কেরীর নেতৃত্বেই আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রথম যুগ (ইং ১৮০০-১৮১৫) অর্থাৎ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যুগ গঠিত হয়। এই যুগের প্রধান লেখক ছিলেন উইলিয়ম কেরী, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, হরপ্রসাদ রায় প্রভৃতি।

এঁদের সকলের গদ্যবচনাই পাঠ্যপুস্তকের সীমাবন্ধ গন্ডীর মধ্যেই আবন্ধ ছিল। ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে 'বেদান্তগ্রন্থ' নিয়ে বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে রামমোহনের আবির্ভাব। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে বাংলা গদ্যেব ব্যবহার করে রামমোহন বাংলা গদ্যের ক্ষেত্র প্রসারিত করলেন: বাংলা গদ্যের দ্বিতীয় যুগেব সূচনা হল।

উনিশ শতকের প্রথম হতে আধুনিক বাংলা গদ্য বিভিন্ন লেখকের রচনা-রীতির মধ্য দিয়ে আপনার সাহিত্যিক প্রকাশেব যে আদর্শ খুঁজে ফিরছিল এবং বিভিন্ন রীতি নিয়ে যেসব পবীক্ষা-নিবীক্ষা চলছিল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভাষায় তা সর্বপ্রথম সাহিত্যিক রূপ লাভ করল। ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে বিদ্যাসাগরের 'বেতালপঞ্চবিংশতি' গ্রন্থ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গদ্যের প্রকৃত সাহিত্যিক যুগ আবম্ভ হল। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের যে 'ছন্দ-ভিত্তি' স্থাপন করেছিলেন প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র তারই উপর তাঁর কাব্যকীর্তির নিদর্শন নির্মাণ করেন।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কাব, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমের লেখনীতে বাংলা সাধুভাষার উৎকর্ষ দেখা গেল। কিন্তু সেকালে চলিত ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য চর্চা করলেন মাত্র দু'জন লেখক—প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ। স্বামী বিবেকানন্দ বাংলা গদ্যে যে বিশেষ রীতির প্রবর্তক, সেই রীতিব তিনি শ্রেষ্ঠ লেখক হলেও, একক নন। কালগতভাবে প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ—এই দু'জন স্বামীজীব পূর্বসূরী। তাই এঁদের ভাষা-রীতির বৈশিষ্ট্য আলোচনা-যোগ্য।

১৮০১ খ্রীস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেব আওতায় প্রকাশিত চলিত ভাষায় রচিত প্রথম পুস্তক উইলিয়ম কেবীর কথোপকথন। কেরীর কথোপকথন-এর ভাষা সাহিত্য সৃষ্টিব কাজে ব্যবহৃত হয়নি। তাই সে ভাষার সাহিত্যিক মূল্য নির্ণয় করার প্রশ্ন ওঠে না। এদিক থেকে প্যারীচাঁদ মিত্র শুধু প্রথম চলিত গদ্যেব রূপকারই নন, তিনি বাংলাসাহিত্যের সর্বপ্রথম ঔপন্যাসিক। প্যারীচাঁদ বচিত উপন্যাস 'আলালের ঘবের দুলাল' তাঁবই সম্পাদিত মাসিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। মুখবন্ধে এই পত্রিকাব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি লিখেছেনঃ "এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদের জন্য ছাপা হইতেছে। যে ভাষায় আমাদিগেব সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন। কিন্তু তাঁহাদিগেব নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।" এর থেকে বোঝা যায় যে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে প্যাবীচাঁদ চলিত বাংলা রচনায় হাত দিয়েছিলেন তা ছিল নিতান্তই সীমিত। সাহিত্যে কথিত ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে তিনি কোন জোরালো দাবি তুলতে পারেননি। এদিক থেকে ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে ২০শে

ফেব্রুয়ারী তারিখে 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদককে লেখা স্বামীজীর একটি চিঠি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চিঠিতে স্বামীজী লিখেছেনঃ

"বুদ্ধ থেকে চৈতন্য, রামকৃষ্ণ পর্যন্ত যাঁরা লোকহিতায় এসেছেন তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন।......চলিত ভাষায় কি আর শিল্প-নৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাহাতেই ত সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর, তবে লেখবার বেলাও কি একটা কিম্ভূত-কিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শনবিজ্ঞান চিন্তা কর, সে ভাষা কি দর্শনবিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় ত নিজের মনে এবং পাঁচজনে, ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর? .. ভাষাকে করতে হবে--যেমন সাফ্ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা, সংস্কৃতের গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক চাল নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ।" স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যুর ১২ বছর পরে ইং ১৯১৪তে সবুজপত্রের মাধ্যমে প্রমথ চৌধুরী এই দাবি তুলেছিলেন। কিন্তু যুক্তির দিক থেকে এ বিষয়ে এর চেয়ে নতুন ও সঙ্গত কথা বোধহয় তাঁরও জানা ছিল না।

কথ্য ভাষাকে আশ্রয় করলেও প্যারীচাঁদ সাধুভাষার প্রভাব একেবারে বর্জন করতে পারেননি। ভাষা-শিল্পী হিসাবে প্যারীচাঁদের অক্ষমতা অনেকাংশে সংশোধিত হয়েছে কালীপ্রসন্নের রচনায়। কিন্তু কালীপ্রসন্ন যত বড় ভাষা-শিল্পী ছিলেন তার চেয়ে বেশী ছিলেন জীবনরসিক। সেকালের বাঙালী-জীবন-সমালোচনায় তাঁর যতখানি আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে, ভাষা-শিল্পের উৎকর্ষের দিকে তিনি ততখানি দৃষ্টি দেননি। তাই বঙ্কিমচন্দ্র কালীপ্রসন্নের ভাষাকে অসংলগ্ন ও অপবিত্র বলে নাকচ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু কালী-প্রসন্নের অপরিণত ভাষাই পরবর্তীযুগে বিবেকানন্দের হাতে প্রাণবন্ত হয়েছে।

সঙ্গীতে, শিল্পে বিবেকানন্দের অনুরাগের কথা আমাদের জানা আছে। কিন্তু বাংলা চলিত ভাষার যে তিনি একজন অসামান্য লেখক এ-কথাটি অনেকেই বিস্মৃত হন। বিবেকানন্দের জীবন মাত্র ৩৯ বৎসর। এই সংক্ষিপ্ত জীবনের শেষ তিনটি বছর তাকে আমরা সাহিত্য-শিল্পী হিসাবে দেখতে পাই। বিবেকা-নন্দের মৌলিক গদ্যরচনার বই মোট চারটি,—'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত' 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'। এই চারটি বই-এর রচনাংশ ধারাবাহিকভাবে 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। স্বামীজীর প্রথম মৌলিক গদ্য রচনা সাধুভাষাতে। প্রথমদিকে তিনি নিজস্ব কোন লিখনশৈলী ঠিক করে উঠতে পারেননি, বঙ্কিম প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করেছেন। যেমন—"সমষ্টির জীবনে

ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যষ্টির, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য—জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাঁহার সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যষ্টির একমাত্র কর্তব্য। শুধু কর্তব্য নহে, ইহার ব্যতিক্রমে মৃত্যু—পালনে অমরত্ব। প্রকৃতির চক্ষে ধূলি দিবার শক্তি কাহার? সমাজের চক্ষে অনেকদিন ঠুলি দেওয়া চলে না। উপরে আবর্জনারাশি যতই কেন সঞ্চিত হউক না, সেই স্তূপের তলদেশে প্রেমস্বরূপ নিঃস্বার্থ সামাজিক জীবনের প্রাণস্পন্দন হইতেছে। সর্বংসহা ধরিত্রীর ন্যায় সমাজ অনেক সহেন, কিন্তু একদিন না একদিন জাগিয়া উঠেন এবং সে উদ্বোধনের বীর্যে যুগযুগান্তরের মলিনতা ও স্বার্থপরতারাশি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়।”- (বর্তমান ভারত)।

‘পরিব্রাজক’ বইটি স্বামীজীর দ্বিতীয়বার বিলাত ভ্রমণের কাহিনী। এ বইএর অধিকাংশ জাহাজে ভ্রমণকালে ও প্রবাসে রচিত। এই সময় থেকে ভাষা-রীতি সম্বন্ধে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত পথ স্থির করলেন, চলিত ভাষায় ‘পরিব্রাজক’ রচিত হল। পরিব্রাজকের গদ্যরীতির একটু নিদর্শন তুলে দেওয়া হল—

“হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্মল নীলাভ জল—যার মধ্যে দশ-হাত গভীরের মাছের পাখনা গোণা যায়, সেই অপূর্ব সুস্বাদ হিম-শীতল ‘গাঙ্গ্যং-বারি মনোহারী’ আর সেই অদ্ভুত ‘হর্ হর্ হর্’ তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সামনে গিরি নির্ঝরের ‘হর্ হর্’ প্রতিধ্বনি, সেই বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জলপান, চারিদিকে কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভর বিচরণ। সে গঙ্গাজল-প্রীতি; গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গ্যবারির বৈরাগ্য স্পর্শ। . . গেলবারে আমি একটু নিয়ে গিয়েছিলুম—কি জানি! বাগে পেলেই এক আধ বিন্দু পান করতাম। পান কল্লেই কিন্তু সে পাশ্চাত্য জনস্রোতের মধ্যে, সভ্যতার কল্লোলের মধ্যে, সে কোটী কোটী মানবের উন্মত্তপ্রায় দ্রুত পদসঞ্চারের মধ্যে, মন যেন স্থির হয়ে যেত। সে জনস্রোত, সে রজোগুণের আস্ফালন, সে পদে পদে প্রতিদ্বন্দ্বী সংঘর্ষ, সে বিলাসক্ষেত্র, অমরাবতীসম প্যারিস, নিউইয়র্ক, বার্লিন, রোম সব লোপ হয়ে যেত; আর শুনতাম—সেই “হর্ হর্”, দেখতাম—সেই হিমালয়-ক্রোড়স্থ বিজন বিপিন, আর কল্লোলিনী সুরতরঙ্গিনী যেন হৃদয়ে মস্তিষ্কে শিরায় শিরায় সঞ্চার করছেন, আর গর্জে গর্জে ডাকছেন—“হর্, হর্, হর্”

—(পরিব্রাজক)।

কালীপ্রসন্ন সিংহের ‘হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা’ প্রকাশিত হবার প্রায় ৩৭ বছর পরে স্বামীজী চলিত ভাষায় ‘পরিব্রাজক’ বইটি লেখেন। তাই কালীপ্রসন্নের দ্বারা তাঁর প্রভাবিত হবার প্রশ্ন এখানে অবান্তর। তাছাড়া তখন ছিল

সাধুভাষার যুগ। ছাত্রাবস্থায় নরেন্দ্রনাথকে পড়তে হয়েছিল অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ', বিদ্যাসাগরের 'সীতার বনবাস', বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী। প্যারীচাঁদ ও কালীপ্রসন্নের দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত না হয়েই তিনি স্বভাবশিল্পীর মতোই তাঁদের ভাষার দুর্বলতা কাটিয়ে সহজ স্বাভাবিক রূপ দিয়েছেন।

'পরিব্রাজক' রচনার পব চলিত ভাষার শক্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হয়ে তিনি 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' রচনায হাত দিয়েছিলেন। পরিব্রাজক সুখপাঠ্য ভ্রমণ-কাহিনী আব 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' মৌলিক চিন্তা-সমন্বিত প্রবন্ধ পুস্তক। কিন্তু স্বামীজী পরিব্রাজক বই-এ যে চলিত গদ্যরীতির মান তুলে ধরেছেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে তা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। যেমনঃ

"আসল কথা হচ্ছে, যে নদীটা পাহাড় থেকে ১০০০ ক্রোশ নেমে এসেছে সে কি আব পাহাড়ে ফিরে যায, না যেতে পাবে? যেতে চেষ্টা যদি একান্ত কবে তো ইদিক উদিকে ছড়িয়ে পড়ে মাবা যাবে, এইমাত্র। সে নদী যেমন করে হোক সমুদ্রে যাবেই দুদিন আগে বা পবে, দুটো ভালো জায়গাব মধ্য দিয়ে, না হয় দু-একবাব আঁস্তাকুড় ভেদ কবে। যদি এ দশ হাজাব বৎসবের জাতীয জীবনটা ভুল হয়ে থাকে তো আর এখন উপায় নেই, এখন একটা নতুন চরিত্র গড়তে গেলেই মবে যাবে বই ত নয়।"--(প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)।

বাংলা কথ্য ভাষায় লিখিত স্বামীজীর পত্রগুলির গদ্যভঙ্গীও অপূর্ব। স্বদেশ ও বিদেশেব শ্রেষ্ঠ পত্রসাহিত্যিকদেব, এমন কি ববীন্দ্রনাথের পত্রেও এমন অকুণ্ঠ, প্রাণবন্ত ভাষাব নিদর্শন মেলে না। বিবেকানন্দের 'পরিব্রাজক' 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পত্রাবলী' প্রভৃতিব একটি অপূর্ব সঞ্জীবনী শক্তি ও স্বচ্ছন্দ রূপ দেখা যায়। ধরা যাক স্থাপত্য সম্বন্ধে তাঁর কথা—

"বাড়ীটার না আছে ভাব, না ভঙ্গী। থামগুলোকে কুঁদে কুঁদে সারা কবে দিলে, কিন্তু সে গয়নায় লতা-পাতার চিত্রবিচিত্রেব কি ধুম!...

মনেব অশান্তি, তাব মানে কোনো কাজ নেই। গাঁয়ে গাঁয়ে যাও, ঘবে ঘরে যাও; লোকহিত, জগতেব কল্যাণ কর। নিজে নরকে যাও, পবেব মুক্তি হোক, আমার মুক্তির বাপ নির্বংশ।"

কিম্বা পত্রাবলীতে সেই মহৎ আত্মাব উচ্চারণ,—

"এই হাজাব বছরের ক্রমবর্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজাব বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে শক্তিক্ষয় করছ! পৌরহিত্যরূপ আহাম্মকির গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছ! শত শত যুগের অবিরাম সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে—তোমরা কি বল দেখি?"

কিম্বা সেই বজ্রগম্ভীর প্রার্থনা ঃ—

"তোমরা উচ্চবর্ণেরা কি বেঁচে আছ ?. তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে, মালী, মুচি, মেথরের ঝুপড়ীর মধ্য হতে।...এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার সয়েছে,—তাতে পেয়েছে অপূর্ব জীবনীশক্তি। এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উলটে দিতে পারবে। আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না।.. অতীতের কঙ্কালচয়! এই সামনে তোমার উত্তরাধিকারী ভবিষ্যৎ ভারত। তোমার রত্নপেটিকা, তোমার মাণিকের আংটি ফেলে দাও। আর তুমি হাওয়ায় বিলীন হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাও; কেবল কান খাড়া রেখো। তোমার সেই হাওয়ায় বিলীন হওয়া, অমনি শুনবে, কোটি জীমূতস্যন্দী ত্রৈলোক্য-কম্পনকারী ভারতের উদ্বোধন "ওয়াহ্ গুরুজীকী ফতে।"

ভাষার এই পৌরুষ সেই পুরুষসিংহের ব্যক্তি-স্বরূপ থেকেই উদ্ভূত। তাই চলতি বাংলায় এমন প্রাণবন্ত বলিষ্ঠ প্রকাশ আর কারও পক্ষে সম্ভব হোল না।

অমূল্যধন দাশশর্মা

## বিদেশী কবিতা

### টি, ডব্লু, এইচ, ক্রস্‌ল্যান্ড

#### ঈগল

ও কে ওরা দেখ বন্ধ করেছে খাঁচায়।
ছোট ছেলেপুলে ঘুর ঘুর কবে
খাবাব টুকরো ঠোঁটে দেয় ভরে,
পথে বাজে লোক বলাবলি কবে—"বাস্‌রে,
কি ভয়ানক পাখী, ওর কাছে যাস্‌নে।"
শিষ্ট ভদ্র পথচাবী কয় "আস্তে,
(হায়) আকাশের বাজা বন্দী আজকে কি দোষে!"
আশাহীন আক্রোশে
খেপে ওঠে না কো রোষে,
অপরাজেয় সে, নির্ভীক চোখে তাকায়।
প্রদীপ্ত তাব বুক
উড়ে যেতে উৎসুক,
(ধীরে) সূর্যের পানে দুইচোখ তুলে ধবে॥

অনুবাদ : মনীশ ঘটক

### এডোয়ার্ড লুমি-স্মিথ

#### অনুপস্থিত

বজ্রগর্ভে ঘোর ঘনঘটা। পড়লো বাজ ?
না পাতলেও প্রস্তুতি যেন চল্‌ছে আজ।
কঠিন পাহাড় মেঘের সার। একটি তার
পীনাগ্রভাগ যেন সে প্রোষিতভর্তৃকার।

নারীর উরসে গগনচুম্বী যুগ্মস্তন।
কাঁপে ভেদ করি সূক্ষ্ম কাবায় আস্তরণ।
দুগ্ধ ধবল মর্মরতল; চিত বিভল,
ঊর্ধ্বে ব্যজনী করবে কি তারা হিমশীতল?

অসহ্য কামনা-বিবশা কামিনী, রুদ্ধভাষ
অনুপস্থিত উদাসী পুরুষ। ব্যর্থ আশ,
স্তনাগ্রচূড় মেঘমেদুর কাঁপে বিধুর
দূরে সরে যায় দাহনতপ্ত স্পর্শাভাস॥

অনুবাদ : মনীশ ঘটক

### ই, ইভাতুশেঙ্কো

দ্বারে করাঘাত

"কে তুমি ওখানে?"
        "আমি বয়সের জীর্ণতা,
        আমি তোমার কাছে এসেছি।"
"পরে এসো!
        এখন আমি বড় ব্যস্ত
        আমার এখন অনেক কাজ।"
"বেশ তো বাছা,
        কিন্তু মনে রেখো
আমি তোমারই জন্যে দরজার বাইরে অপেক্ষা করছি।"
লেখকের কাজ শেষ,
        টেলিফোনে কিছু কথা,
        এবং অবশেষে ভাজা ডিম খেয়ে
দরজা খুলে দেখি,
        বাইরে কেউ অপেক্ষা করে নেই।
তবে কি বন্ধুরা কেউ
        ছেঁদো ঠাট্টা করে গেল?

অথবা সম্ভবত
আমিই ভুল করেছি নামকরণে;
বয়সের জীর্ণতা নয়,
আমাকে ডেকেছিলো প্রবীণতা।
থামতে জানে না বলে
অবশেষে সে
দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেছে।

অনুবাদ: নির্মল ঘোষ

## ডিলান টমাস

### স্থির হয়ে শোও, নিদ্রা-শান্ত হও

স্থিব হয়ে শোও, নিদ্রা-শান্ত হও, যে-আর্ত গলায় ক্ষত নিয়ে
জ্বলছো এবং এপাশ-ওপাশ করছো। সাবাবাত
নিঃশব্দ সমুদ্রে ভেসে আমরা শুনেছি
নুনের চাদরে ঢাকা ক্ষত থেকে উৎসারিত ধ্বনি।

চাঁদের অর্ধেক ক্রোশ নিচে আমরা শিউবে উঠেছি শুনে-শুনে
মুখর ক্ষতের থেকে রক্তেব মতন এই নির্গলিত সমুদ্রের স্বর,
প্রবল গানেব ঝড়ে নুনের চাদর ভেঙে পড়লে, সকল
নিমগ্ন মৃতের স্বব বাতাসে সাঁতাব কেটে ভাসে।

মন্থর বিষণ্ণ পাল ছিঁড়ে একটা পথ করে দাও
নিরুদ্দেশ নৌকোর দরোজাগুলি খুলে দাও বাতাসের দিকে
এখন যাত্রার জন্যে আমাব ক্ষতের অন্ত খুঁজে,
সমুদ্রের স্বর গেয়ে ওঠে নুনেব চাদর এই কথা বলে।
স্থির হয়ে শোও, নিদ্রা-শান্ত হও যন্ত্রণাকে ঢাকো
অথবা আদেশ মেনে আমরা তোমার সঙ্গে নিমগ্নের মধ্য দিয়ে যাবো।

অনুবাদ: স্নেহাকর ভট্টাচার্য

## টম গান

একে একে আসে তারা
অন্ধকারে ঃ বন্ধু ক'জন,
এবং কয়েকজন ইতিহাসখ্যাত নাম নিয়ে।
কেমন বিলম্বে তারা আলোকিত হতে শুরু করে!
অদৃশ্য হবার আগে তবুও দাঁড়ায়
পুঙ্খানু-সঠিক রূপে; সমস্ত অতীত

তাদের সমস্ত নিয়ে নাড়াচাড়া করে
বিড়ম্বনাপূর্ণ এক পোষাকের মতো।
এই মানুষেরা যাবা, ভেবেছি যে, বেঁচেছে শুধুই
প্রতি উষ্ণ আলোড়নে ক্ষয়িত সত্তার
সমূহ আবেগ ফেব জয় করে নিতে।
তারাই স্মরণে আনে, এখন দূরেব।

বস্তুত এখনো তাবা পায়নি বিশ্রাম,
তথাপি যে-হেতু তাবা বিচ্ছিন্ন এখন,
পৃথক পতন হতে,
নিজেকে সবায গাঢ় অনিচ্ছায়,
দুবূহ বিশ্বাসে
নক্ষত্রেব মতো কক্ষপথে।

অনুবাদ ঃ দিব্যেন্দু পালিত

ফেদেরিকো গারথিয়া লরকা

## আত্মহত্যা

(বোধহয় সে নিজের জ্যামিতি জানত না।)

একদিন সকাল দশটায়
যুবকটি ভুলল।

তার হৃদয় ভাঙা ডানা আর নকল ফুলে
ভরে উঠেছিল।

সে মৌখিক গ্রহণ করল
শুধু একটি শব্দ বাদ পড়ে গেল।

যখন সে তার দস্তানা খুলল
সূক্ষ্ম ছাই পড়ল হাতদুটি থেকে।

ঝুলন্ত বারান্দা থেকে সে দেখল একটি বুরুজ
এবং নিজেকেই বারান্দা ও বুরুজ ভাবল।

অবশ্য সে দেখছিল কেমন করে ওই ফ্রেমে
বন্ধ ঘড়ি তাকে লক্ষ্য করছিল।

সে দেখল তার ছায়া রেশমী সাদা ডিভানের
উপর ছড়িয়ে স্থির।

এবং বালকটি ঋজু জ্যামিতিক
কুড়ুল দিয়ে ভেঙে ফেলল আরশি।

যখন আরশি ভেঙে গেল, ছায়ার একটি প্রচণ্ড স্রোত
তার অলৌকিক প্রকোষ্ঠ প্লাবিত করল।

অনুবাদঃ কার্তিক লাহিড়ী

বিয়োগপঞ্জী

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবীণ সাহিত্যিক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক-গমনে আমরা আত্মীয়-বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করছি। মণিলাল পরিণত বয়সে পরলোক গমন করেছেন কারণ বাঙালীর আয়ু বিচারে আটাত্তর বৎসর পরিণত বয়সই বটে। "স্বয়ংসিদ্ধা", "অপরাজিতা", "রাগিণী", "জাগ্রতা ভগবতী" ও "দুঃখের পাঁচালী" প্রমুখ অসংখ্য উপন্যাস ও কাহিনীর রচয়িতা মণিলাল বাংলা সাহিত্যের পাঠক-সমাজে একটি বিশেষ পরিচিত নাম। বাঙালী সাহিত্যেকদের মধ্যে তার বিশিষ্ট স্থান ছিল। সে যুগের এবং এ যুগের এমন কোন পত্র-পত্রিকা ছিল না যা মণিলালের রচনা প্রকাশ করে ধন্য হয় নি। কেবল উপন্যাস সাহিত্য নয়—নাট্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাঁর অসাধারণ অবদান। মূলত নাট্যকার হিসাবেই মণিলাল সর্বপ্রথম খ্যাতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। বাজীরাও, মাধবরাও, অহল্যা-বাঈ প্রমুখ তাঁর রচিত বহু ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক কেবল সাধারণ রঙ্গ-মঞ্চেই নয়, অপেশাদার নাট্য-রসিকদের দ্বারা বহু জায়গায় অভিনীত হয়েছে। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগের জন্যই মূলতঃ তিনি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃক গিরিশ অধ্যাপক পদে বৃত হন। শিশুসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও তিনি সবিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। বিখ্যাত ব্যক্তিদের শিশুপাঠ্য জীবনীর সঙ্কলন "ছোট থেকে বড়" ও "মন্দ থেকে ভাল" এই পর্যায়ের প্রখ্যাত রচনা।

মণিলালের জীবন বৈচিত্র্যপূর্ণ। মধ্য বয়সে তিনি কাশীতে আসেন। ব্যবসায়ের প্রবল মোহে বহুদিন তিনি স্থায়ীভাবে কাশীতে বাস করেছিলেন—কলকাতার সঙ্গে সমস্ত সংশ্রব ছিন্ন করে। এমন কি তাঁর প্রিয় রঙ্গমঞ্চের আকর্ষণও তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল। ব্যবসায়ী মণিলালের সমস্ত মন বাণিজ্যের মোহজালে আবদ্ধ থাকলেও, একটি সাহিত্যিক সত্বার প্রভাব তিনি কোন সময়েই অস্বীকার করতে পারেন নি।

প্রবাস থেকে আমরা একখানি মাসিক-পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাব করা মাত্র তিনি সানন্দে তার সমস্ত ব্যয়ভার বহনে স্বীকৃত হন। তারই ফলে কাশী থেকে সর্বপ্রথম 'প্রবাসজ্যোতি' মাসিক-পত্রিকা প্রকাশিত হয় শ্রদ্ধেয় দাদামশায় কেদার-নাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনায়।

ভাগ্য-বিপর্যয়ে সেই সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসাও একদিন তাসের প্রাসাদের মত ভেঙে পড়ল। মণিলালকে আবার সাহিত্যের আঙিনায় ফিরে আসতে হয়।

মানুষ মণিলালও সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন। অগ্রজের স্নেহদৃষ্টি দিয়ে তিনি অনুজ সাহিত্যিকদের ঘিরে রাখতেন। এক কথায় তিনি ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গমহলের যথার্থ অভিভাবক। কেবল সাহিত্যিক সমাজই নয়, যে কোন ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসেছেন তিনিই ঐ সদালাপী, অমায়িক ও সামাজিকতার আদর্শ নিরিখ বয়োবৃদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে ফিরে গেছেন।

মৃত্যু প্রকৃতির স্বাভাবিক বিধান। সুতরাং মণিলালের মত একটি সফল জীবনের পরিসমাপ্তিতে শোক প্রকাশ করব না। তাঁর গুণগ্রাহী সাহিত্যিক সমাজ ও প্রকাশকদের কাছে আমাদের কেবল নিবেদন এই যে, মণিলালের অপ্রকাশিত রচনাবলী যথাযথভাবে সম্পাদন করে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করা হ'ক। আজও তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের গিরিশ বক্তৃতাগুলি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। তাঁর শেষ বৃহৎকর্ম নূতনভাবে সম্পাদিত মহাভারতের শেষটুকু সম্পাদনা করে যেন যথাসময়ে প্রকাশিত হয়।

(উত্তরা শ্রাবণ ১৩৭০) সুরেশ চক্রবর্তী

দিলীপকুমার সেন

উনিশশো তেষট্টির জানুয়ারির এক সন্ধ্যায় দিলীপকুমার সেন মারা গেছেন, এ মৃত্যু নির্মম! কফিহাউসের ওপর তলায় কবির স্মৃতিতে সম্প্রতি শোক সভা হয়ে গেল। মৃত্যুর নির্মমতা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু এ পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গে আমাদের দেখাশোনা বড় কম। দীর্ঘ আটমাস হাসপাতালের নির্দ্দিষ্ট বিছানায় শরীরের অসহনীয় যন্ত্রণা, মনের নিঃসঙ্গ বিভীষিকা—এই নিয়ে তেত্রিশ বছরের এক যুবক কবিকে দিন রাতের চব্বিশটি ঘণ্টা জেগে থাকতে হয়েছে। মনে হয় মৃত্যু যেন সেদিনই তাঁকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে যেদিন অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন। মাঝখানের এই দীর্ঘসময় একটা দুর্বিসহ নরকবাসের যন্ত্রণা!

॰ কি হবে বেঁচে?

॰ না, না, আমি বেঁচে থাকবার কোন অর্থ খুঁজে পাইনা।

॰ অসম্ভব, এ অবস্থায় আমি আমার ভবিষ্যৎ জীবন কল্পনাও করতে পারিনা।

॰ জানেন, এক এক সময় আমার মনে হয় কি হবে কবিতা লিখে? মানে, আরো দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে?

॰ প্রেম? জীবনসঙ্গিনী? জানিনা এগুলো সত্যি মানুষ পায় কিনা!

যখনই কথা হয়েছে রাস্তায়, চায়ের দোকানে, কোনো মাঠের সবুজ ঘাসের ওপর বসে, এমনি টুকরো টুকরো কথার মধ্যে দিলীপ সেনের একটি নিঃসঙ্গ একা, বড় একা একটি ক্লান্ত কবিসত্বাকে খুঁজে পেয়েছি। জানিনা, কফি হাউসের মুখর, উজ্জ্বল কবিসভায় তাঁর জীবন দর্শন অন্যতর ছিল কিনা!

দু'পুরুষ আগে কবির পূর্বপুরুষেরা থাকতেন নাটাগড়-ঘোলায়। দু'পুরুষ ধরে, পিতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন সেনের সময় থেকে ছিলেন হাওড়ায়। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে দিলীপ সেন ছিলেন সবচেয়ে ছোট এবং বোনেদের একমাত্র আদরের ভাই। পিতার আকস্মিক মৃত্যু এবং সাংসারিক বিরুদ্ধতায় বি. এ পরীক্ষা দেওয়া আর হয়ে উঠল না। তারপর বিরাট অভিজ্ঞতার সংসার ক্ষেত্র এবং সব শেষে সুখলাল কারণানী হাসপাতাল। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে কবিকে হাওড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকায় সুখলাল কারণানী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

'উত্তর তরঙ্গের নায়ক' কবি দিলীপ সেনের একমাত্র কাব্যগ্রন্থ। এ ছাড়া তাঁর বহু কবিতা বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। কবিতা রচনায় তাঁর জীবন সম্বন্ধে ঔদাসীন্য অত্যন্ত স্পষ্ট, এবং তাঁর কবিতার সর্বত্র অশ্রু-লিপ্ত-বেদনা তিক্ত আত্মদহনের চিহ্ন সুস্পষ্ট। এ সম্বন্ধে তাঁর একটি উদ্ধৃতি দিলাম।—'ও যেন সেই এক সম্মোহিনী দ্বীপ, যার দিকে সব নাবিকের সমুদ্র যাত্রা, অবশ্যম্ভাবী পরিণামের মতো হয়ত পৌঁছে দেবে। রবীন্দ্রনাথের উত্তর পাঠক বা উত্তর সাধক হিসেবে আমরা একদিন অন্তত নিশ্চিত জানব—আনন্দের সে নির্বিকল্প বেদীর পাশে অশ্রুলিপ্ত ও বেদনাতিক্ত একটি স্থান, চিরস্থায়ী হয়ে আছে, তা আমাদের আত্মহননের চিহ্ন আমাদের কাব্যানুসন্ধান।'

'....audience does not know what to do, whether to laugh or to cry, that will be a success for me.' লরকার এই উদ্ধৃতিটি উত্তর তরঙ্গের নায়ক গ্রন্থের ভূমিকায় কবি দিলীপকুমার সেন সেদিন তুলে ধরে যে 'বক্তব্যকে' রাখতে চেয়েছিলেন তাঁর কাব্যনাটকের সার্থকতা সম্বন্ধে, জানিনা সেইটিই তাঁর জীবন রঙ্গমঞ্চের শেষদৃশ্য সম্বন্ধেও ভেবেছিলেন কিনা। তবে আজ আর তাঁর failure অথবা success সম্মন্ধে আমাদের ভাববারও অবকাশ নেই। জানিনা, কবি দিলীপকুমার সেনের এই অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনার পর বেদনার্দ্র তিরোধানে আমরা শোক এবং দুঃখের বহির্প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়িয়ে বন্ধু বিচ্ছেদের আশাহীনতায় আর্তনাদ করে উঠব অথবা দুর্ঘটনার তিল তিল যন্ত্রণা থেকে মুক্তির নিশ্বাস নেব বুক ভরে।

**শান্তি লাহিড়ী**

## সমালোচনা সাহিত্য

### কৈশোর অভিজ্ঞান ঃ দুটি উপন্যাস

সুরজিৎ দাশগুপ্ত তাঁর একটি অনবদ্য গদ্যকবিতায় লিখেছেন ঃ

কখনও যেখানে মানুষের পা পড়েনি
সেখানে নরম সবুজ ঘাস গজিয়ে ওঠা
পরাক্রান্ত নিঃশব্দতা
কতদিন শুনিনি।

হয়ত শুনব না কোন দিন আর॥

(দ্বিতীয় পৃথিবী, প্রেম)

এই আশঙ্কা যতই সত্য হোক, পরাক্রান্ত নিঃশব্দতা তাঁর অনুধ্যানে সব সময়েই কাজ করছে বলে মনে হয়। এই অনুভূতি এবং একই সমুদ্র নামক প্রথম উপন্যাসেই দুর্বার এবং দ্বিতীয় উপন্যাস দিনরাত্রিতে তীব্রতর ও পুনর্নব হয়ে উঠেছে। প্রথম উপন্যাসের রচনাকাল ১৯৫৩-৫৭, দ্বিতীয়টির ১৯৫৭-৬১। প্রায় এক দশকব্যাপী একটি প্রস্তুতিবৃত্ত যেন। অথচ বাজারে পীনায়তন উপন্যাসের তুলনায় কতো শীর্ণশরীরী এই দুটি বই- একটিতে ১৪৬ পৃষ্ঠা অন্যটিতে ১৫৪। সব মিলিয়ে দুশো পৃষ্ঠার পরিসর। হয়তো প্রথানুগত সমালোচনার এই পরিমিতিকে উপন্যাসের পথে অকিঞ্চিৎকর অথবা শ্বাসরোধী বলবেন। কিন্তু প্রস্তুতিপরায়ণ এই কবি-ঔপন্যাসিকের রচনার পাঠক দু'খানি বইকেই উপন্যাস পর্যায়ভুক্ত করবেন।

তার কারণ তিনি উপন্যাস ফেঁদে বসেননি, উপন্যাসের আয়তনে একটি কবিতার বীজকে অঙ্কুরিত হতে দিয়েছেন। কবিতা থেকে উপন্যাসের জন্মকে তিনি কোথাও প্রাণপনে লুকিয়ে ফেলেননি, অথচ মৃন্ময় জীবন সম্পর্কে একটি জীব-চেতনাকেও অগ্রাহ্য করেননি, সেই কারণে আমি তাঁর উপন্যাস দুটিকে কাব্যোপন্যাস বলবো না। কবিতার দ্বারা আক্রান্ত হয়েও তাঁর উপন্যাস উপন্যাস।

দুখানি গ্রন্থের কোনটিতেই বহ্বারম্ভ নেই। আছে অনেকগুলি আরম্ভ ও

---

একই সমুদ্র—সুরজিৎ দাশগুপ্ত। ডি. এম. লাইব্রেরি। তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।
দিন রাত্রি—সুরজিৎ দাশগুপ্ত। ডি. এম. লাইব্রেরি। তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

সমাপনের অন্তর্লীন বৃত্তান্ত। এরি মধ্যে ঐকিক একটি প্যাটার্ন পাঠকের চোখে পড়ে যায় যা নিহিতার্থের মূলে একান্ত বাস্তব ও জীবন্ত। বস্তুত, ঘটনাব মতো এত শঠতা আর কার আছে? ঘটনা মানবচরিত্রকে আমন্ত্রণ করে এবং অতঃপর পরিবর্তিত কবে ফিরিয়ে দেয়। ঘটনার হাতে ঘুরে-ঘুরে চরিত্র ধাতব গুণ যতই অর্জন করুক, মৌল ধাতুরূপ হাবিয়ে ফেলে। অথচ জীবন তো শুধু পরিবর্তন নয়, অপরিবর্তনীয সারসত্তা বলে কিছু নিশ্চয় আছে। অতএব ঘটনাকে কৃত্রিমভাবে না এড়িয়েও ঘটনা থেকে একরকম আত্মপ্রত্যাহার ভালো। সুরজিৎ দাশগুপ্তের নায়কচরিত্র, অনেকটা এইরকম বিবেকী বোধে ঈষৎ সংলগ্ন থেকেও বিবিক্ত, এবং বিবিক্ত হয়েও পৌরুষেয় স্নিগ্ধতায় কমনীয়। সে যখন বিদ্রোহ করে, ঝড়কে সমর্থন কবে, তখনো গাছপালাব উৎপাটন তার কাম্য নয, শিকড়ই তার লক্ষ্য। ঘটনার শিকড় অর্থাৎ চরিত্রের কেন্দ্রীয় মুহূর্তটি খুঁজে পাওয়ার আর্তি তার অপবাপব অসম্পূর্ণতাকে মুহূর্তে ঢেকে ফেলে। এ সম্পর্কে ঔপন্যাসিক যে কতো সচেতন তার একটি প্রমাণ, যৌবনের আলেখ্য এঁকেই তিনি কৈশোরেব আলেখ্য আঁকতে শুরু করে দিয়েছেন। যৌবন থেকে তাঁর অগ্রসৃতি অনিকেত জরায় নয়, প্রত্যাবর্তন কৈশোবের আত্মলীন আশ্রয়প্রবণতায়। এখানে প্রত্যাবর্তন উৎসমুখী বলেই অগ্রসৃতির নামান্তর। সুচেতনই সুমন হয়ে উঠেছে। সুচেতনের ঐশী নির্মিতি আবার ফিরেছে তার ভাঙাচোরা উপজ্ঞা ও উপাদানের দিকে। প্রেমের যুগ্মতা ফিরে এসেছে নিঃসঙ্গ স্বপ্নসংক্ষোভে, পরাক্রান্ত নিঃশব্দতায়। আধুনিক প্রেমিকের পরিবেশ নেই অথচ পরিপ্রেক্ষনী আছে, অনোন্য দ্বৈতত্ব নেই অথচ অনর্পিত অনন্যতাব বিষণ্ণ মাধুর্য আছে। সুচেতন যতটুকু সঞ্চারিত, সুমন তার শতাংশও নয়। পারমিতা যেটুকু সংবেদনশীল, ডলিমাসি তাব কণামাত্রও নয়। সুমন এবং ডলিমাসির অস্তিত্বের মধ্যে কোনো তারবার্তা ঘটে না, কিন্তু এই দুই প্রতিহত চরিত্র দুই প্রান্ত থেকে একটি ট্র্যাজিক সৌন্দর্যকে তুলে ধরে যা অনেকটাই রিল্‌কের এপিটাফের অনুষঙ্গে সুন্দরঃ

> ঘুমে এরাও নিদ্রাহীন। টেবিলে অনন্ত রাত্রির লণ্ঠন, উৎকণ্ঠায় ম্লান। বিছানাব উপব ডলি বসে, হাঁটুতে মুখ গুঁজে। একবার মুখ তুলল, ফ্যাকাশে, যেন কিছু শুনতে চাইছে। শুনল, জানালায পাইনের পাতায় পাহাড়ের গায় সজল বাতাস বইছে আহত পাখিব কান্নার মতো। আর কিছু নয়। (দিনরাত্রি, পৃঃ ১৫৩)

বয়ঃসন্ধির দলিল আঁকতে বসেন নি সুরজিৎ। তা সত্ত্বেও যে এক এক জায়গায় তাঁর লক্ষ্য অপব্যাখ্যাত হবে তার জন্য তিনি নিজে যে দায়ী নন। দিনরাত্রির পরে একই সমুদ্রে রচিত হলে তাঁর কৈশোর সম্পর্কিত মূল প্রতিপাদ্যই নষ্ট হতো, কিন্তু যেহেতু হতে-থাকাব একটি উহ্য কালানুক্রম সেস্থলে

থাকতো, সমালোচক লেখকের অভিপ্রায়কে অন্য কোনো দৃষ্টিকোণ থেকে অনুমোদন করতে পারতেন। কিন্তু লেখক দিনরাত্রি গ্রন্থে কৈশোরকে পুনর্বার রচনা করে নিতে গিয়ে যেমন মূলত সফল হয়েছেন, স্বাভাবিক পৌর্বাপর্য লঙ্ঘনের দরুন এক-একবার চরিত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন। একটি দৃষ্টান্ত :

> ... সত্যিকার মোরগ আঁকতে তার বয়েই গেছে। তাহলে তো একটা মোরগ ধরে এনে টেবিলের উপর বেঁধে দিলেই হতো। সুমন চেয়েছিল রংগুলোকে খুব সুন্দরভাবে সাজাতে, তারপর এমনভাবে জিনিষটা ফুটে উঠবে যে দেখতে হবে মোরগের মতো। কিন্তু মোরগ নয়, দেখতে শুধু মোরগের মতো। তাই ওভাবে সাজানো রংগুলোকে ডাকবার সুবিধের জন্যে নাম দেবো—মোরগ। (পৃঃ ৭২)

এ শুধু অবাস্তব নয়, আপত্তিকর। প্রতীকপন্থার পরিভাষা যে কোনো কিশোর জানবে না এমন কথা বলছি না। কিন্তু কৈশোরের একটি ভূগোল আছে যেখানে বড়ো-বড়ো অসম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পাথর ছড়ানো বলেই তার আবেদন এত অমোঘ। তাই এই রকম কালানৌচিত্য শুধু লেখকের projection বা অভি-ক্ষেপটিকে অত্যন্ত উগ্রভাবে স্পষ্ট করে।

প্রাকরণিক নৈপুণ্যের দিক থেকে একই সমুদ্র যতটা সার্থক দিনরাত্রি ততটা নয়। তার অন্যতম হেতু প্রথমোক্ত উপন্যাসের অনুপুঙ্খতা। এবং চিন্তন সেখানে অনেক বেশি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য :

> অনুভব করল সেই মুহূর্তটি যখন সে তার হাতে পেয়েছিল পারমিতার হাত। অপূর্ব সংবাদ বহন করে পারাবত ফিরে এল। প্রলয় প্লাবনে সৃষ্টি ভেসে গিয়েছে। অন্তহীন জলরাশির মধ্যে ভাসছে নোয়ার নৌকো। তিনি নৌকোর কিনারা ধরে দাঁড়িয়ে। এমন সময় দূর দিগন্তে দেখলেন একটা বিন্দু। সেই বিন্দু ক্রমে পারাবতের রূপ নিল। আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন নোয়া। মহাপ্লাবনের জল সরে ডাঙা দেখা দিয়েছে কিনা দেখবার জন্যে তিনি কপোত উড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেই কপোত ফিরে এল তাঁর হাতে। তার চঞ্চুপুটে এক সবুজ কিশলয়। আদিবৃক্ষের অভিজ্ঞান। (একই সমুদ্র—পৃঃ ১৪৫)

আদিবৃক্ষ এখানে archetype-এর সমর্থদ্যোতক। কৈশোরের বিশ্বাসে এই প্রাক্‌রূপ মেলে। কিন্তু এই কৈশোরের দ্বিতীয় কৈশোর। তাকে অর্জন করতে গিয়ে সুরজিৎ দাশগুপ্ত দিনরাত্রিকে সর্বাঙ্গীন সাফল্যে শ্রীমণ্ডিত করেননি হয়তো; কিন্তু সেই সৌর সরলিমাকে সুলভ আবেগে ত্বরান্বিত করেন নি তিনি, শিল্পীর নন্দন ধৈর্যে আমাদের সর্বধ্বংসী অনাস্থাকে বিশাল একটি সম্ভাবনার সামনে স্থগিত রেখেছেন, সেইখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

আ লো চ না

## আধ্নিক কবিতার শব্দ

কীটসের 'এনডিমিয়ন' কবিতা সম্পর্কে কেউ কেউ মনে করেন যে, এর প্রথম লাইনে ছিল ঃ A thing of beauty is a constant joy.

পরে অবশ্য আমবা পেলাম ঃ . . joy for ever. বিস্ময়ের সংগে আমরা লক্ষ্য না করে পারি না এই পরিবর্তনে কবিতাটির আত্মা কী পরিমাণে বিস্তৃতি লাভ করেছে। লাইনটি পড়ার সংগে সংগে কানে ভাসতে থাকবে ঃ

এখন এ-কথা আর কাউকে না বলে দিলেও চলে যে সম অর্থবহ যে কোন শব্দ সংযোজন করলেই বাক্যের ব্যঞ্জনা আমাদের কাছে প্রসারিত হয় না। কোন শব্দের নিজস্ব অভিধানিক অর্থ ছাড়াও ভিন্ন দ্যুতি থাকে। আর, এই ভিন্ন দ্যুতি সম্পন্ন শব্দই কবিতার পক্ষে পরম প্রযোজ্য এ-কথা মনে করি।

'জীবনানন্দ ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কবিতায় 'মানুষ' শব্দের পরিবর্তে 'মান ' কথাটির ব্যবহারই বোধ হয় বেশী ইংগিতপূর্ণ। এবং ঠিক একই ভাবে অ । আবিষ্কার কবতে পারি 'দেহলতা' বা তনুলতা' ইত্যাদি না বসিয়ে জীবনানন্দ 'শরীর' শব্দটির প্রয়োগের দ্বারা আমাদের কী রকম উত্তেজিত করলেন।

আবার বলি, শব্দের একটা অভিধানগত অর্থ নিশ্চয়ই থাকবে, কিন্তু তাকে ব্যবহার করতে হবে, এলিয়টের ভাষায়, চোর যেমন মাংসের টুকরো দিয়ে প্রহরী কুকুরকে ভুলিয়ে রাখে। 'তা বুঝতে গেলে পাঠককে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলে চলবে না—সক্রিয় অধ্যবসায়ই কবিতা উপভোগের চাবিকাঠি।'

তাই আধুনিক কবিবা শব্দ সম্পর্কে এতো বেশী সচেতন। তাঁরা কবিতার সানতন রহস্য উদ্ধার করতে পেরেছেন শব্দের মধ্যে। হাজারো রকম মাল-মসলার শীর্ষদেশে দাঁড়িযে আছে শব্দ, এই শব্দই কবিতার মুখ্য উপাদান। শব্দের কারুকার্যই একই বস্তুর ব্যঞ্জনাকে ভিন্নতর করতে পারে। শব্দের পরীক্ষাই কাব্যের পরীক্ষা। অতএব, আমরা এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারি ঃ

> 'শব্দ অর্থের ঘনিষ্ট ও বিচিত্র যোগাযোগের পরেও এ-কথা বলা যায় যে কবি মাত্রই শব্দ ব্যবহারে, সংগীতে শ্রুতিব্যবহারের মতই অথবা ছবিতে বণ্ড ব্যব-হারের মতই সূক্ষ্ম বিবেচনাবোধের পরিচয় দেবেন। কেননা, যথাযথ শব্দ প্রযোগেই কবিতার সুনির্দিষ্ট অবযব তৈরী হয়। বিশেষত শব্দপ্রয়োগের ত্রিবিধ উদ্দেশ্য থাকে; প্রথম সুর সংযোজনা, দ্বিতীয় চিত্রময়তা, তৃতীয় কবিকুশলতার পরম তত্ত্ব ভাবতন্ময়তা।'
>
> (অরুণ ভট্টাচার্য ঃ কবিতার ধর্ম ও বাংলা কাব্যের ঋতুবদল

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে-কোন শব্দ একটা না একটা উদ্দেশ্য সাধন করে। যাঁর যে রকম লক্ষ্য তিনি সেই রকম শব্দই গ্রহণ করবেন। এই শব্দ গ্রহণ করার চাতুর্যের উপরই কবিকৃতি নির্ভর করছে। এ-সম্পর্কে আরাগঁ বলেছেন 'তাই বলি যে ভাষার গভীর চর্চা ছাড়া, প্রতি পদে ভাষার পুনর্নির্মাণ ছাড়া কাব্য অসম্ভব। তার জন্যে ভাষার নির্ধারিত সীমা, ব্যাকরণের নিয়ম, বাক্যের কানুন বারবার ভাঙতে হয়।'

স্পষ্টতই আমরা সকলে জানি, এ-যুগের সঙ্গে পূর্বতন যুগের কী বিশাল ফারাক। আমাদের পূর্বের সে জীবন সম্পূর্ণ ভাবেই অতীতঃ কী সামাজিক কী অর্থনৈতিক অবস্থা একান্তভাবেই নবীন। সুতরাং এদের ফলশ্রুতি হিসেবে চিন্তাধারারও আমূল পরিবর্তন এসেছে। আর, এই নতুন চিন্তাকে রূপ দেয়া যায় একমাত্র নতুন ভাষার সাহায্যে, নতুন শব্দের সাহায্যে। নতুন শব্দ বলতে শুধু এই বুঝবো না যে নবাবিষ্কৃত শব্দ, পুরোনো শব্দের নতুন এবং অভিনব প্রয়োগকেও বুঝতে হবে। এখানেই শিল্পীর আবিষ্কারের আনন্দ, যেখানে শিল্প ক্রমাগত বহমান থেকে যাচ্ছে।

আধুনিক কাব্যে আমরা লক্ষ্য করছি গদ্যের ভাষাকে অবলীলাক্রমে কবিতায় টেনে আনা হয়েছে, নিছক ঘরোয়া শব্দ—এমন কি গ্রাম্য প্রবাদ এখানে অপাঙক্তেয় হয়ে নেই। শুধু তাই নয় একেবারেই গ্রামীণ শব্দের সঙ্গে হাত মিলিয়ে খাস ইংরিজি শব্দ, সংস্কৃত শব্দ আধুনিক কাব্যে অবাধ ঢুকে পড়েছে। এই স্বাধীনতা পাবার ফলে আমাদের পুরোনো প্রচলিত কাব্যিক শব্দঃ ছিনু, গেনু, মনে, হিয়া প্রভৃতিকে বাদ দিতে হয়েছে নির্মমভাবে। তবে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যে 'বাখানি', 'পাসরিল' ইত্যাদি শব্দগুলিকে ব্যবহার করেছেন সে-সম্পর্কে বক্তব্য, অসীম প্রয়োগ নৈপুণ্যে সেগুলি পুনরায় সজ্জিত হয়ে আমাদের কাছে বিভাসিত। এই দু'এক বছর আগে পর্যন্ত কবিতায় প্রচুর অব্যয়ের ব্যবহার আমরা দেখেছি। বিশেষ করে সংযোজক এবং বিয়োজক অব্যয়ঃ যেহেতু, অতএব, এবং, ও, কিংবা, সুতরাং, কারণ ইত্যাদি। এমন কি কবিতার প্রথম লাইনের প্রথম শব্দটি অব্যয় দিয়ে শুরু করার ঝোঁক ছিল। ইদানীং তা আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

লুই আরাগঁ যে কথা বলেছেনঃ

> 'ভাষা খুঁজি বাতাসের স্তরে স্তরে
> যে ভাষা ঘুমের ব্যূহ ভেদ করে সূর্যরশ্মির মতো
> যে ভাষা স্বচ্ছ জলে তৃষ্ণা মেটায়—'

আমরা সেই কথাই একটু অন্যভাবে বলতে পারি, শব্দ প্রয়োগে বা গঠনে মিতব্যয়িতা আনতে হবে; সেই সঙ্গে একটি শব্দের মধ্যে দিগন্তপ্রসারী ব্যঞ্জনার ঘ্রাণ, অর্থাৎ অর্থঘনত্ব সৃষ্টি।

শুধু তাই নয়, কোন কবিতার একটিমাত্র শব্দ আমাদের চিন্তা এতোদূর প্রসারিত করে যে মনে হয় আমরা আমাদের পূর্বপিতামহদেব রহস্যময় অলিন্দে অলিন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছি। 'শ্রাবস্তী' 'বিদিশা' আমাদের কাছে dreamy heavy lgnd ; এও একপ্রকার ধ্বনির সৃষ্টি।

কোন কিছুই ফেলনা নয়—সব কিছুরই সার্থকতা আছে, একথা আধুনিক কবিরা বুঝেছেন। হাঁটু, সেমিজ, থুতনি, আঙুল, ছুঁয়ে ছেনে, টেরিকাটা, ঠ্যাং, বিয়োবার, ব্যাং, পেঁচা, কাঁকড়া, বোলতা, ইঁদুর খড় তাড়ি জঞ্জাল প্রভৃতি শব্দগুলোকে অপূর্বভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

> এই বলে ম্রিয়মান আঁচলের সর্বস্বতা দিয়ে মুখ ঢেকে
> উদ্বেল কাশের বনে দাঁড়িয়ে রহিল হাটুভর
> হলুদ রঙের শাড়ি, চোবকাটা বিঁধে আছে, এলোমেলো অঘ্রানেব খড়
> চাবিদিকে শূন্য থেকে ভেসে এসে ছুঁয়ে ছেনে যেতেছে শরীর।

আধুনিক কাব্যের আরেকটি লক্ষণ—কোন শব্দের বা কোন চিত্রের বাববার ব্যবহার। কর্ডেলিয়ার মৃত্যুর পর লিয়র পাঁচবাব শুধু 'never' কথাটি উচ্চারণ করলো, তাতেই তার ট্রাজেডি আরো মর্মস্পর্শী আরো অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এককালে এমন এক সময় ছিল, যখন ইংরেজি কিংবা অন্য কোন বিদেশী শব্দকে আমাদের নিজেদের মতো করে পরিবেশন করা (বিষ্ণু দের এলিয়টেব কবিতা দ্রষ্টব্য) হোত, কিন্তু যখন আজ আমরা এক বৃহৎ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি—যে দরজা দিয়ে বিশ্বের সব লোকই প্রবেশ কবছে—তখন শব্দ-গুলোকে তাদের রীতিতেই রাখতে পারি। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেনঃ.

> এ-সিদ্ধান্তে বোধ হয় অনেকে সায় দেবেন যে যীশুব জীবনী লিখতে এখন যেমন অনূদিত বাইবেলের আক্ষরিক রীতি অনাবশ্যক, তেমনই অনাবশ্যক ক্রীশমাসের পবিবর্তে জন্মাষ্টমীর ব্যবহাব।

কোন কোন কবির কোন কোন শব্দের প্রতি একটা নেশা আছে। সেই সব শব্দগুলোকে ঘুরে ফিরে তাঁরা ব্যবহার করেন। বোদলেয়রেব শব্দের সংখ্যা পবিমিত ছিলঃ নির্বেদ, শূন্যতা, গহ্বর, সমুদ্র, জাহাজ, মাস্তুল, শব, কফিন, কবর, কঙ্কাল, তিক্ত, মধুর, কৃষ্ণ, শীতল, সুগন্ধা, ডাইনি, পিশাচী; স্ফিংকস-গভীর, বিলাসী, অন্ধকার, উজ্জ্বল, রহস্যময়—এই সব শব্দ তিনি ব্যবহাব করেছেন। এ প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশের কথা কারো অজানা থাকার কথা নয়।

আমার সমস্ত কথার সারাংশ করলে এই দাঁড়ায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কথাতেঃ

> "কখনও যদি লিখবাব মতো কথা মানসে জমে, তবে তাব উচ্চারণ পদ্ধতিও আপনি জোগাবে। তা না হলে পুরোনো খোড়বড়িখাড়া করে কোন লাভ নেই, কাবণ 'কাব্যের ইতিহাস তার টেকনিকের ইতিহাস'।"

**সামসুল হক**

বস্ত্র শিল্পে অপরিহার্য্য

এম. এম. সি-র

কার্ডিং এঞ্জিন

ও

স্পীড ফ্রেম

মেশিনারী ম্যানুফ্যাকচারার্স কর্পোরেশন লিঃ

ম্যানেজিং এজেন্টস্ঃ মহীন্দ্র এণ্ড মহীন্দ্র লিঃ

পি ৬১বি সারকুলার গার্ডেন রীচ রোড

কলিকাতা ৪৩

ফোন—৪৫-২৭৮৫